অনীক

জুলাই ২০১৪

বর্ষ ৫১ □ সংখ্যা ১

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় □ ১

ঘটনাপ্রবাহ

হত্যা, ধর্ষণ এবং □ সহদেব মন্ডল □ ২

কেউ কলা খায়নি □ মালবিকা মিত্র □ ৩

পাঠকের কলমে

নিষ্ফলা নির্বাচন □ ৪

প্রবন্ধ

মোদির বাজেট □ রতন খাসনবিশ □ ৫

“সুদিন” আসছে □ পরিচয় কানুনগো □ ৭

কৃষি জ্ঞান-উদ্যোগ, জনস্বাস্থ্য □ সমরেশ মিত্র □ ১১

বিশ্বশক্তির নতুন খেলা □ দারা-শুকো □ ১৫

জমি এবং পর্বান্তর— □ গোর্কি চক্রবর্তী ও অশোক কুমার রায় □ ২৪

স্মরণ

স্মরণ : সুশীল রায় □ অপূর্ব □ ৩৩

সুকুমারী ভট্টাচার্য □ গার্গী □ ৩৪

একটি মানুষের মতো মানুষের কাহিনী— □ শুভাশিস মুখোপাধ্যায় □ ৩৭

গ্রন্থ সমালোচনা

গদ্যসংগ্রহ : অমলেন্দু চক্রবর্তী □ শুচিব্রত সেন □ ৩৯

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :

প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯

দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা

ই-মেল : aneek.bm@gmail.com

ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয়

বামপন্থার মুক্তি

ভারতে যারা বামপন্থার তকমাধারী, সেই সিপিএম এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের সংসদে সংখ্যাগত উপস্থিতি এক করুণ অবস্থায় উপনীত হয়েছে। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে এই বামজোট কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা থেকে মাত্র ১১টি আসন পেয়ে সংসদীয় রাজনীতিতে নখদন্তহীন এক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

সিপিএম-এর এই পরাজয়ে, বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ বামপন্থার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখতে শুরু করেছেন যেন সিপিএম-ই গিরি গোবর্ধনের মতো আঙুলের ডগায় বামপন্থাকে ধরে রেখেছে। পার্টি নেতৃত্বের সমালোচনার জন্য যাঁরা বিতাড়িত, তাঁরাও মনে করেন, নেতৃত্ব থেকে দু-চারজনকে হটিয়ে দিলেই পার্টি আবার বামপন্থী রূপ ধারণ করবে। প্রকাশ কারাত তাঁদের পার্টি মুখপত্রে লিখছেন, “বিজেপি হোক বা কংগ্রেস— কেন্দ্রীয় সরকার অনুসৃত নয়া উদারনৈতিক নীতির বিরোধিতা সিপিআইএম ধারাবাহিক ভাবে করে এসেছে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষা এবং এই উদারনীতির আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা আন্দোলনে নিয়োজিত থেকেছে। সিপিআইএম এবং বামেরা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিকল্প নীতির জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বামেরা ধর্মনিরপেক্ষতার দৃঢ় সমর্থক, সাম্প্রদায়িক নীতির বিরোধী এবং সামাজিক ভাবে নিপীড়িত শ্রেণীর অধিকার রক্ষায় ব্রতী। এইসব কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও, নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, জনসমর্থন, বিশেষত যুব সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায় করতে পার্টি ও বামেরা ব্যর্থ হয়েছে।” (পিপলস ডেমোক্রাসি, ৬ জুলাই ২০১৪)।

ভোট পাননি বলে, কারাত মহাশয়ের জনগণের উপর অভিমান হতেই পারে। কিন্তু যে কথাগুলি বলে তিনি সিপিএম-এর বাম চরিত্র বর্ণনা করেছেন, সেগুলো মানুষ বিশ্বাস করে বলে মনে হয়না। সংসদে তাঁরা বিরোধী দলের ভূমিকায় ছিলেন। সেখানে ইসু ভিত্তিক বিরোধিতা তাঁদের কখনো কখনো করতে দেখা গেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, কেরলে, যেখানে তাঁরা সরকারে ছিলেন, সেখানে সেই নয়া উদারবাদী নীতির প্রয়োগে তাঁদের কখনো দ্বিধা দেখা যায়নি। খোলাখুলি বৃহৎ পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সেজ প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে, এফডিআই এবং বেসরকারিকরণকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সংসদে পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করছে, রাজ্যে বামফ্রন্ট পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছে। বামফ্রন্টেরই মুখ্যমন্ত্রী বণিকদের সভায় দাঁড়িয়ে বলতে পারেন, “দুর্ভাগ্যবশত আমি এমন এক দলের সদস্য, যারা স্ট্রাইক করে এবং আমাকে চুপ করে থাকতে হয়।” সিপিএম-এরই পলিট ব্যুরো সদস্য বলতে পারেন, তাঁরা এখন সমাজতন্ত্র নয় পুঁজিবাদ প্রাকটিশ করছেন। দেং শিয়াও পিং তাঁদের চোখে এক ‘great visionary’। বৃহৎ এনক্লেভ তৈরী করে সাধারণ কৃষকের জমি কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া, সিপিএম-এর মতে বামপন্থা। কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে সাধারণ কৃষকের উপর হামলা করা, গুলি চালানো— এ সবই বামপন্থা! মেকি বামপন্থীদের প্রত্যাখ্যান করার জন্য জনগণকে কি খুব দোষ দেওয়া যায়? ভেকধারি পুঁজিবাদীদের অপসারণ করে স্থান নিয়েছে উগ্র পুঁজিবাদ। এটাই স্বাভাবিক। এর মধ্যে বামপন্থার পরাভব কোথায়?

বামপন্থার সংকটের কারণ অন্যত্র নিহিত। জাতীয় পর্যায়ে সংগঠিত ও সমন্বিত আন্দোলনের বিপর্যয়, বিক্ষিপ্ত গণ-আন্দোলনগুলিতে শ্রেণী চেতনার দুর্বলতা, অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংসদীয়-বাম বহির্ভূত অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির সময়োচিত ভূমিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা সামগ্রিকভাবে বামপন্থাকে পঙ্গু করে রেখেছে। গণসংগ্রামের বিকাশই বামপন্থাকে এই পঙ্গুত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে।

ঘটনাপ্রবাহ

হত্যা, ধর্ষণ এবং আজকের রাজনীতি

দিল্লির রাস্তায় গণধর্ষণ থেকে কামদুনি, হাওড়ায় তপন দত্ত, সুতিয়াতে বরুণ বিশ্বাস থেকে সৌরভ চৌধুরির হত্যা সভ্য জগতের যাবতীয় মান্য রীতিনীতিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেশ, জাতি এবং আমাদের রাজ্যের সামাজিক চালচিত্রকে সর্ব অর্থেই বেপর্দা করে দিল।

সৌরভকে হত্যা করে হত্যাকারীরা হিংস্র আনন্দে তার দেহকে টুকরো টুকরো করেছে। হত্যা-হিংসা-রিরংসা কন্টকিত এই বঙ্গে হত্যাকারীরা, প্ররোচনাকারীরা তাদের নেতাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে দেশের আইনকে এড়িয়ে যাচ্ছে, সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তা (মুখ্য এবং স্বরাষ্ট্র সচিব), সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হত্যাকারীর সঙ্গে প্রকাশ্যে জনসমাবেশ করছেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি পকেট থেকে রিভলবার বার করে হত্যার, গণধর্ষণের হুমকি দিচ্ছেন— আবার তিনি সরকারি খরচে (পড়ুন আপনার-আমার করের টাকায়) বেলভিউতে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছেন।

কবিরা সর্বদাই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হন, তাই সেই কবেই জীবনানন্দ বলেছিলেন, 'অদ্ভুত আঁধার এক নেমেছে এ পৃথিবীতে আজ...'। তাও তো তিনি তাপস পাল, শ্যামল কর্মকার, মণিরুল-অনুব্রতদের দেখেননি। ১৯৩২ সালে বার্লিন শহর একসময় আঁকাবাঁকা হাতে লেখা পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছিল— তাতে লেখা ছিল যে, 'হিটলার আমাদের চাকরি দাও, রুটি দাও, নইলে আমরা আবার অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়বো'। যারা এই পোস্টার সেঁটেছিলেন, সেই কর্মহীন, আধা-বেকার, সমাজের উচ্চ কোটিতে ওঠার সিঁড়ি থেকে পিছলে নিচে নেমে যাওয়া বিপুল পরিমাণে মানুষকে 'চাকরি', 'রুটি'-র জোগাড়ের জন্য হিটলার দিয়েছিলেন ইহুদিদের সম্পত্তি লুঠ করার অবাধ সুযোগ, তথাকথিত আর্য জাতির নামে বাড়ি, টাকা, গয়না ও অন্যান্য সম্পত্তি দখলের ক্ষেত্রে আইনী সুরক্ষা। সমাজের চোখে যে সমস্ত 'পেশা' প্রান্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য, সেগুলিকে বহু-বিস্তৃত করে, সাধারণের চোখে নায়কদের মাধ্যমে সেগুলিকে গ্রহণযোগ্য করা এবং সমাজের দুর্বৃত্ত অংশটিকে পয়সা লোটার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা ছিল হিটলারের আদর্শের একটি উপাদান। আমাদের রাজ্য সেই একই আদর্শ রূপায়ণের পথে পা বাড়িয়েছে।

কুলবেড়িয়াতে বেআইনি মদ-এর তথাকথিত ঠেক-এর সংখ্যা বেড়েছে পাঁচ গুণ। পুলিশ বলছে তারা জানেনা এই সমস্ত ঠেকের অস্তিত্ব, কেননা কেউ তাদের কাছে অভিযোগ জানায়নি। এর আগে সার নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে শিলাদিত্য চৌধুরী মাওবাদী তকমা নিয়ে হাজতবাস করেছেন। স্থানীয়ভাবে সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে শহিদ হয়েছেন শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস, কামদুনির ঘটনায় প্রতিবাদ করায় স্থানীয় শিক্ষক প্রদীপবাবুর হেনস্থা রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। এই অবস্থায় টগবগে যুবক ছাড়া কেই বা সংগঠিত 'আন্ডারওয়ার্ল্ড'-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে?

দিদি একদিকে সুগত বসুকে দিয়ে নেতাজির উত্তরাধিকারের সংকেত পাঠাচ্ছেন, অন্য দিকে তাপস পাল গুন্ডাদের ভাষায় ("আমি কলকাতার মাল নই, চন্দননগরের মাল। রংবাজী অনেক করেছি। পকেটের রিভলবার দিয়ে শায়েস্তা করবো...") বার্তা পাঠাচ্ছেন সাট্টার মালিক, চোলাই মদ ব্যবসায়ী, তোলাবাজ ও জমির প্রোমোটারদের। সংস্কৃতিক আগ্রাসন আর পেশীর আস্ফালন, এই দুই-এর যুগলবন্দীতে প্রতিবাদী, প্রতিরোধী শক্তিকে আপাতভাবে রুদ্ধ করার চেষ্টায় অনুব্রত-মণিরুল-শ্যামল কর্মকারদের সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন বর্তমান তৃণমূল সরকার।

হিটলারের কায়দায় সরকারি অনুদান প্রাপ্ত ক্লাবগুলি পাড়ায় পাড়ায় প্রতিবাদী মানুষদের ওপর অত্যাচার করছে। প্রতিবাদী শিল্পী স্থানীয় বাজারে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্থানীয় ক্লাবের যুবকদের দ্বারা হেনস্থা হয়েছেন। দৈনিক মজুরির পুলিশ প্রতিবাদীদের পেটাচ্ছে। বিশ্বায়নের প্রথম ধাক্কায় এই যে বিপুল 'সংরক্ষিত কর্মীবাহিনী' তৈরি হয়ে গেছে, তারা যত অসংগঠিত থাকে, তত তাদের সম্মিলিত দরাদরি করার ক্ষমতা কমে। তাদের বশংবদ রাখা অপেক্ষাকৃতভাবে তত সহজ হয়, তাদেরকে সামান্য টাকা আর আপাত নিরাপত্তার আশ্বাসে প্রলুব্ধ করে ভ্রাতৃঘাতী কাজে লিপ্ত করানো যায়। যে অনিশ্চয়তা এই অসহিষ্ণুতা এবং সমষ্টিগত সমাধানের পরিবর্তে ব্যক্তিগত সমাধান খোঁজার নিষ্ফল রাস্তায় এদের ঠেলে দেয় তার থেকে বেকার বাহিনীর কোনো অংশই মুক্ত নয়। প্রতিটি পেশায় এখন দৈনিক মজুরিতে নিযুক্ত মানুষ, 'পার্শ্ব শিক্ষক', 'চুক্তিভিত্তিক চাকরি'র রমরমা। এদের সামনে স্থায়ীকরণের খুড়োর কল ঝুলিয়ে এদেরকে যে কোনও অসামাজিক কাজে নামিয়ে দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই দেখি, শিক্ষক নামধারী মানুষরা মাননীয় উপাচার্যকে হেনস্থা করছেন, বলছেন শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি চলবে না, যদিও তাঁরা একটি রাজনৈতিক দলের পরিচয়েই শিক্ষাঙ্গনে অবস্থান করছেন। যেখানে শিক্ষামন্ত্রী দলীয়, যেখানে দলীয় নির্দেশে আধিকারিক থেকে উপাচার্য সবাইকেই নিয়োগ করা হচ্ছে, সেখানে রাজনীতি না করা বলতে বর্তমান শাসকরা বোঝাচ্ছেন কেবল শাসকদের রাজনীতি করার অধিকার। ঠিক যেমন অতীতে জরুরি অবস্থার সময়ে বা হিটলারের জার্মানিতে নাৎসি পার্টি ছাড়া অন্যান্যদের অস্তিত্ব বিলোপের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস নির্মম; তার প্রতিরোধের বিস্তৃতি দীর্ঘ সময় জুড়ে।

সহদেব মন্ডল

ভ্রম সংশোধন : গত জুন সংখ্যায় সুস্নাত দাশের লেখার ৩৫ পৃষ্ঠাটির কলম দুটি অদলবদল হয়ে যাওয়ায় আমরা দুঃখিত।

কেউ কলা খায়নি

লোকমুখে শোনা বা সিনেমায়-গল্পে দেখা পরিচিত দৃশ্য : বংশগৌরব ও বিত্তকৌলিন্য রক্ষা করতে গিয়ে জাঁদরেল বাবা কোনো দিন ছেলে-পুত্রবধূ বা মেয়ে-জামাই-কে বরণ করলো না। শেষে মৃত্যুশয্যায় বা কোনো অঘটনের পটভূমিতে ভুল বুঝতে পারে। অন্তিম দৃশ্যে বৌমা বা জামাই বা নাতি-নাতনীকে বুকে টেনে নেওয়া। চেনা গল্প। দেয়া নেয়া... সপ্তপদী... কাঁচ কাটা হিরে...। এই গল্প তখনই সম্ভব যদি জাঁদরেল বাবার একটা নরম মানবিক হৃদয় থাকে।

কিন্তু কথায় বলে 'মৃত্যুকালেও পাপী তো কৃষ্ণ বলে না'! হ্যাঁ, যে কোনো মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ মৃত্যুকালে নিজেকে আড়াল করে না, গোপন করে না। কিন্তু 'পাপী' করে। শেষের দিনেও অনুতাপ অনুশোচনা থাকেনা। যদি বা থাকে তা অসৎ উদ্দেশ্যে। মনে আছে, পাপী শয়তান কর্তামশাই মৃত্যুর আগে প্রতিবেশীর কাছে ঘোষণা করলো তার পর্বতপ্রমাণ পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত ও শাস্তি হলো গঞ্জ এলাকায় প্রকাশ্যে তার মৃতদেহ শূলে চড়ানো। এতেই তার আত্মার শান্তি। তারা কর্তার অনুরোধ পালন করলো। থানায় খবর গেল, সবার হাতকড়া পড়লো। শালা কর্তা! মরে গিয়েও সবাইকে...।

কথাটা হলো এবারের (২০১৪) লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের (!) ভরাডুবি প্রশ্নাতীত। সিপিএম শিবরাত্রির সলতে হয়ে টিমটিম জ্বলছে অস্তিত্ব অনস্তিত্বের মাঝে। সিপিআই, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক সংসদীয় পটভূমিতে চিত্রবৎ। পশ্চিমবঙ্গেও বহু কেন্দ্রে বামেরা তৃতীয়, চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হতবিহ্বল— 'প্রত্যেকে তাকিয়েছে প্রত্যেকের দিকে, কেন এমন হলো!' সত্যিই কি এটা আকস্মিক? অতি সাধারণ বুদ্ধির মানুষ সিঙ্গুরে পুলিশি পীড়নের দিন রাত্রে খালপাড়ে আড্ডায় মন্তব্য করেছিল 'বুদ্ধর ওয়াটারলু'। সেদিন থেকে শুরু কাউন্টডাউন... ২০০৮ পঞ্চায়েত... ২০০৯ লোকসভা... ২০১০ কর্পোরেশন ও পৌরসভা... ২০১১ বিধানসভা... ২০১৩ পঞ্চায়েত... ২০১৪ লোকসভা... কাউন্টডাউন চলছেই। কোথায় আকস্মিকতা? বরং প্রতিটি পরাজয়ের কারণ সন্ধানের শুরুতেই ছিল পূর্ব-সিদ্ধান্ত : শিল্পনীতি হারের কারণ না... পুঁজির তোষণ কর্পোরেটে সেবা হারের কারণ না... সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম নেতাই হারের কারণ নয়। 'আমি কলা খাইনি' ফর্মুলায় হারের কারণ সন্ধান চলছে। কারণ পাওয়া যায়নি সঙ্গত কারণেই। আজও পাওয়া গেল না। মৃত্যুকালেও পাপী তো কৃষ্ণ বলে না। ভুল চিহ্নিত হোক ব্যক্তিগত স্তরে, নতুন মুখ পুরাতন মুখ, বুড়ো ছোকরা, ফর্সা কালো, রোগা মোটা, পণ্ডিত মুখ্যু, যা খুশি। কিন্তু ভুলেও যেন নীতিগত প্রশ্ন না ওঠে। তাহলে একত্রে গোটা পার্টিটা 'কনডেমড' হবে। কর্পোরেট তোষণ তো বাদ যাবে না; তাহলে ব্রান্ডেড সার্ট-ডিওডোরেন্ট-এসি কার-এসি অফিস-উড়ান যাত্রা চলবে কী করে? অতএব কলা খাইনি ফর্মুলা!

এই নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সিপিআই নেতা গুরুদাস দাশগুপ্তের একটি অবিস্মরণীয় সংযোজন পাওয়া গেল ৮ জুন ২০১৪ খড়দহে, প্রয়াত নেতা গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে। 'ভাববার সময় এসেছে কেন বামপন্থীদের গ্রহণযোগ্যতা কমেছে'। ২০০৫-এ সিঙ্গুর, ২০০৭-এ নন্দীগ্রাম, তখন ভাবার সময় আসেনি। ২০০৮-এ পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে লোকসভা-পৌরসভা-বিধানসভা তখন সময় হয়নি। কারণ যেভাবেই হোক উনি সাংসদ হয়েছেন। আর ওনারা বিশ্বাস করতেন মানুষ ভুল করেছে, ভুল শোধরাবে। আজ যখন মুছে যাবার উপক্রম, বলছেন ভাবার সময় এসেছে। ভণ্ডের আত্মজিজ্ঞাসা। আমরা ভাববো, যাক দেরিতে হলেও ভাবছেন তো, মন্দ কী? মন্দ তো বটেই। 'বামপন্থীদের গ্রহণযোগ্যতা'র কথা বলেছেন। মনে রাখবেন বাঁ দিক ধরে চললেই হয়না, অভিমুখ উল্টো হলে বাঁদিক আসলে দক্ষিণপন্থা। যেদিন দলের অভিমুখ পাল্টে গেল সেদিনও 'ভাবার সময়' এলো না! আশ্চর্য!

খড়দহে তিনি আর কী বললেন? বললেন, 'বামপন্থীরা এখন পিছনের সারিতে'। বুঝতে বাকি নেই গুরুদাস বাবু আন্দোলন-লড়াই-গণসংগ্রামের পেছনের সারি বলেন নি। সে তো কবেই হয়েছে। উনি আক্ষরিক ভাবে সংসদে ৯ জন সাংসদ নিয়ে পিছনের সারিতে বসার কথা বলেছেন। একেই বলে সংসদ-সর্বস্বতা। যতদিন জিতলো ভাবলো না, সময় হলো না। যো জিতা ওহি সিকান্দার। এখন 'ভাবার সময় এসেছে'। মজার কথা হলো এই ভাবনার ক্ষেত্রেও সতর্ক রক্ষণাত্মক ভূমিকা। মুখ ফসকেও যেন কৃষ্ণনাম না প্রকাশ পায়।

খড়দহে তিনি আরও বললেন, 'নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে পেতে হবে। গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হবে সব শ্রেণীর মানুষের কাছে। যারা ব্যর্থতার কারণ ধরতে পারছেন না তাদের ভবিষ্যৎ নেই।' গুরুদাস বাবুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কারণ উনি ব্যর্থতার কারণ ধরে ফেলেছেন। সেটা হলো 'সব শ্রেণীর মানুষের কাছে' গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হবে। তার মানে এতদিন শ্রেণী পক্ষপাতিত্ব ছিল। কোন্ শ্রেণী? মালিক পুঁজিপতি কর্পোরেট প্রভু? ছিঃ। তা হয় নাকি, লাল ঝান্ডা, বামপন্থা বলে কথা। শ্রমিক-কৃষকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল, তাই নির্বাচনী বিপর্যয়, তাই গ্রহণযোগ্যতা কমে গেল? আজ্ঞে না, উকিলের

জেরা নয়, আমার মনগড়া শব্দচয়ন নয়। গুরুদাস দাশগুপ্ত নিজেই বলেছেন '১৯১৭ সালের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এখন আর চলবে না। ...নিজেকে না পাল্টালে এই ব্যর্থতা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব না।' অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষকের কাছে গ্রহণযোগ্যতার কারণে হেরে গেল, ১৯১৭-র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচিতে পাঠক্রমে আস্থা রাখার কারণে হেরে গেল। তাহলে পাল্টাতে হবে মানে পুঁজিপতি মালিক কর্পোরেট লবির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। বুদ্ধবাবুরা কত খোলামেলা বলেন, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম হারের কারণ নয়। এটা কম্যান্ড ইকনমির যুগ নয়, বেড়াল সাদা-কালো যা হোক, ইঁদুর ধরলেই হলো।

আসল কথা হলো, তথাকথিত বামপন্থা বহুদিন পূর্বেই শ্রেণী সংগ্রামের পথ বর্জন করে পুঁজির দাসত্ব বরণ করেছে। ফলে বামপন্থা (!) কোনো বিকল্প দর্শাতে ব্যর্থ। আর পুঁজির পথ সমঝোতার পথ দাসত্বের পথে অনেক ভালো গাইড মোদী-মনমোহন। তাই আপনাদের গ্রহণযোগ্যতা কমেছে। এই সত্যকে আড়াল করার জন্য গুরুদাস দাশগুপ্তের কত কসরৎ। এদিক থেকে আরএসপি বর্ধমান জেলা সম্পাদক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক স্বচ্ছ ও স্পষ্ট— 'আমি বরাবর উন্নয়নের কাজ করতে চাই।' কথা হলো অল্প সংখ্যকের উন্নয়নের পুঁজিবাদী পথ বিজেপি বা জাতীয় কংগ্রেসে অনেক মসৃণ। অঞ্জনবাবু লজ্জার মাথা খেয়ে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। বর্ধমানের সিপিআই সম্পাদক রামচন্দ্র সিং বলেন, 'অঞ্জনের বিদায়ে ফ্রন্টের কোনো ক্ষতি হবে না'। সেই নাচতে নেমেও ঘোমটার আড়াল।

বিকল্প দর্শাতে ব্যর্থ বামপন্থা (!), তাই গ্রহণযোগ্যতা ক্রমহ্রাসমান, মানুষ তাদের বর্জন করেছে। রজনীপাম দত্ত এমনটাই লেখেন— ফ্যাসিস্টরা শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস করে না, সোশাল ডেমোক্রাটরা (পড়ুন গুরুদাসবাবুরা) শ্রমিক আন্দোলনকে আগে পঙ্গু করে। মানসিক দিক থেকেও শ্রমিক শ্রেণী হতাশ ও অবসাদগ্রস্থ না হলে ফ্যাসিস্ট বিজয় সম্ভব নয়। গুরুদাস বাবুদের সোশ্যাল ডেমোক্রাটও বলা চলে না। কারণ শেষাবধি তারাও আত্মসমালোচনা করে, 'Our fault is that we never sufficiently prepared ourselves for the events that have overtaken us...today we believe it essential to abandon the democratic illusion and to create a combative, active and audacious Party'। এই আত্মসমালোচনা সপ্তপদী-র পিতার আত্মসমালোচনা। সৎ স্বীকারোক্তি। কিন্তু যারা পুঁজির দাসানুদাস সেবাদাস, তারা অন্তিমকালেও পুঁজির স্বার্থরক্ষা ও আড়াল করতে ভণ্ডামি করে আত্মসমীক্ষার... আমাকে শূলে চড়াও... ওভারের শেষ বল পর্যন্ত পুঁজির মালিকের স্বার্থে বলিপ্রদত্ত। ইতিহাস এদের ক্ষমা করে না।

মালবিকা মিত্র

পাঠকের কলমে

নিষ্ফলা নির্বাচন

'নিষ্ফলা নির্বাচন' (অনীক মার্চ ২০১৪) সম্পাদকীয়র সাথে মোটামুটি সহমত পোষণ করে দুটো বক্তব্য সম্বন্ধে মতামত রাখছি।

১) "...মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি সমাধানের কোনো ইঙ্গিত নেই।" এই অর্থব্যবস্থায় সমাধান সম্ভব? তবে, মূল্যবৃদ্ধিতে সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও অতি আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীরা ....ভাতা বৃদ্ধির রাষ্ট্রীয় নিয়মে অনেকটাই (সুরক্ষা) সমাধান পেয়ে যান। মূল্যবৃদ্ধির আঘাতের ধাক্কায় উচ্চ স্তরের কর্মচারীদের প্রকৃত আয় বেড়ে যাচ্ছে। (বিশ্বায়নের দৌলতে গাড়ি, বাড়ি, ইলেকট্রিক দ্রব্য ও ভোগ্যপণ্যর উৎপাদন বাঁচাতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে উচ্চ স্তরে আয়বৃদ্ধি না ঘটালে বিশ্বায়নের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য)। মূল্যবৃদ্ধির আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে ছোট ছোট বেসরকারী শিল্প সংস্থার কর্মীরা, চাহিদার অভাবে বড় বড় বে-সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা, স্থির আয়ের মানুষজন ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা। তবে দক্ষ শ্রমিক ও পরিশ্রমি অদক্ষ শ্রমিক মূল্যবৃদ্ধির সাথে মজুরি বৃদ্ধি ঘটিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধির আগুন বাজারে তাদের ক্রয় ক্ষমতা কমছে না।

মূল্যবৃদ্ধি ঘটলেই ভাতা বৃদ্ধির যোজনা (মূল্যমান কমাবার যোজনা না নিয়ে) আরো মূল্য বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে অর্থাৎ বাজারে টাকার যোগান আরো বেড়ে যায় উৎপাদন বৃদ্ধি না ঘটিয়েই। এই বাস্তবতাও তুলে ধরা উচিত।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিষেধক হিসাবে 'জাতীয় বেতন কমিশন' (সরকারি বেসরকারি সকলের জন্য প্রযোজ্য কারণ সমকাজে সমমজুরি আইন দ্বারা স্বীকৃত), সকলের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ পেনশন, মূল্যবৃদ্ধি জনিত সুরক্ষা (Income Protection)— শ্রমিক আন্দোলনের মুখ্য দাবী হওয়া উচিত। যা নতুন অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার লড়াইয়ের দাবী হতে পারে।

২) "এই নির্বাচনে আমজনতার প্রাপ্তি কিছু নেই সেটা বোঝার ও বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে।" আমার মনে হয় সেটা বোঝার সময় হয়েছে বলা গেলেও— 'বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে'— বলার সময় হয়নি। 'বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে' পক্ষের শক্তি ও সামর্থ এতই দুর্বল যে, প্রচার এ শক্তি সামর্থ্যে এগিয়ে থাকা দলগুলোর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে জনগণ তাদের হাতেই শাসন ক্ষমতা দিতে বোতাম টিপবেন। প্রকৃত বিরোধী শক্তির উত্থানের প্রতীক্ষা বা প্রকৃত বিরোধী শক্তি বিকাশের জন্য চেষ্টা চালানোই অনীকের প্রধান কাজ হওয়া উচিত। বিরোধী শক্তির বিকাশ ও নিবিড় সংগঠনের উপর 'বুঝিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে' বলা যাবে।

শঙ্কর নন্দী, শেওড়াফুলি

প্রবন্ধ

মোদির বাজেট

রতন খাসনবিশ

মোদি সরকারের প্রথম বাজেটে এদেশের কর্পোরেট মহল খুশি হয়নি। সেনসেক্স প্রান্তিকভাবে হলেও নিচে নেমেছে বাজেটের পরপরই। কর্পোরেটের দাবিমাফিক কাঠামোগত সংস্কারের বকেয়া কাজগুলো চটপট করে ফেলার জন্য যাঁরা সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে রোজ সওয়াল করেন সেই সব বিশেষজ্ঞরা শুধু হতাশা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থেকেছেন, তা নয়, 'লৌহপুরুষ' মোদির 'সাহসের অভাব' খুঁজেছেন তাঁরা এই বাজেটে। এ বাজেট যে ইউপিএ-২ এর বাজেটের বিজেপি সংস্করণ— সে কথাও বলেছেন কেউ কেউ।

এসবের কারণ অবশ্যই আছে। গত এক বছর ধরেই এই সব বিশেষজ্ঞরা 'নীতি-পঙ্গুত্ব'র অভিযোগ তুলেছিল আগের সরকারের বিরুদ্ধে। অর্থনীতির বিকাশের গতি যে ক্রমশ মন্থর হয়ে পড়ছিল, তার কারণ নাকি এই যে দেশি ও বিদেশি কর্পোরেটরা এদেশে বিনিয়োগের উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিল ইউপিএ-২ এর তরফ থেকে আরও বেশি বাজারমুখী সংস্কার করার বদলে 'খাদ্য নিরাপত্তা' বিল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে। তাঁরা বলতেন, মনমোহন সিং-এর সরকার সংস্কার-এর পথে হাঁটছিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে— কর্পোরেট যতটা চায় ততটা সংস্কার ওরা কিছুতেই করছিলেন না বা করতে পারছিলেন না। তারপর আবার রাষ্ট্রের ওপর ক্রমশ বেশি করে দান-খয়রাতির দায় চাপাচ্ছিল। এক 'একশো দিনের কাজ' প্রকল্পই নয়, তার সঙ্গে এসে জুটছিল খাদ্য নিরাপত্তার দায়, যেটাকে বাজারমুখী সংস্কারের কড়া প্রবক্তা জগদীশ ভাগবতী চিহ্নিত করেছিলেন 'বিষবড়ি' হিসেবে। কেন বিষবড়ি? ভাগবতীদের যুক্তিটা এইরকম। এসব করতে গিয়ে সরকার বাজার থেকে বেশি বেশি টাকা ধার করতে বাধ্য হচ্ছিল, যার দরুন বাজারে বেসরকারি বিনিয়োগের টাকার অভাব হচ্ছিল— টাকার যোগান কমছিল বিনিয়োগের বাজারে। যোগান কম থাকায় টাকার ওপর সুদের হার বাড়ছিল। অত বেশি সুদ দিয়ে টাকা নিয়ে নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে কোনো পুঁজিপতিই আগ্রহ দেখাতে পারে না, কেননা এই অবস্থায় চড়া সুদের দায় মেটাতে গিয়ে প্রকল্পের খরচ বাড়বে। প্রকল্পের খরচ বাড়লে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। আর উৎপাদন ব্যয় বেশি হলে উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়ে। পণ্যের দাম চড়া হলে সে পণ্য বাজার পাবে না, বাজার মেরে দেবে বিদেশি পণ্য, যার উৎপাদন-ব্যয় কম। বিনিয়োগকারীরা এসব বুঝেই হাত গুটিয়ে বসেছিল, যার দরুন কারখানা-উৎপাদনে বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমছিল। বৃদ্ধির হার কমছিল অন্যান্য ক্ষেত্রেও। যাদের হাতে সরকারি খয়রাতির টাকা গিয়ে পৌঁছাচ্ছিল তারা অবশ্য পণ্যের বাজারে নতুন চাহিদা তৈরি করছিল, কিন্তু সে সব হলো অতি সাধারণ পণ্য (সস্তার জুতো, ফাইবারের হাল্কা চেয়ার), যার যোগান বাড়িয়ে জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি ঘটবে যৎসামান্য। ভাগবতীদের মতে, প্রয়োজন ছিল সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় কমানো, একশো দিনের কাজ বন্ধ করা, খাদ্য সুরক্ষার দায় ঘাড় পেতে না নেওয়া— যাতে সরকারি ব্যয় কমে, রাজকোষ ঘাটতি কমতে পারে, আর তার ফলে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য টাকার যোগান বাড়ত, সুদের হার কমত, এবং ফলত বিনিয়োগ অর্থাৎ বেসরকারি বিনিয়োগ চাঙ্গা হতো। ইউপিএ-১ না হয় এসব পারে নি অনেকটা সময় বামপন্থীদের ক্রীতদাসত্ব করার বাধ্যতা থাকার দরুন। কিন্তু ইউপিএ-২ এসব কেন করবে?

অভিযোগ জমতে জমতে তা ক্ষোভের বাষ্পে পরিণত হয় এবং শেষ একবছর ধরে এই বিশেষজ্ঞরা প্রায় আস্তিন গুটিয়ে পথে নেমে পড়েছিলেন 'বিকাশ পুরুষ' নরেন্দ্র মোদিকে ভোটে জিতিয়ে এই 'নীতিপঙ্গুত্ব'র অবসান ঘটানোর জন্য। ভোটে মোদি জিতলেনও বিপুলভাবে। তারপর কিছুটা ঘর গুছিয়ে তাঁর চরম আস্থাভাজন অরুণ জেটলিকে দিয়ে বাজেট পেশ করালেন। কিন্তু সেই বাজেট আগের সরকারের একটি সামাজিক প্রকল্পও বন্ধ করল না, খাদ্য নিরাপত্তার দায় নেবে না— একথা বলল না, বরং গণবণ্টন ব্যবস্থা এবং ফুড কর্পোরেশনকে চাঙ্গা করতে বেশি কিছু টাকা বরাদ্দ করল (যা পরোক্ষভাবে এই খাদ্য নিরাপত্তার দায় মেটানোর দায়িত্ব স্বীকার করে)। সেখানেই শেষ নয়। একশো দিনের কাজের জন্য ব্যয়বরাদ্দ কিছুটা বাড়ানো হলো, আর একই সঙ্গে কন্যাসন্তান রক্ষা থেকে ভূমিহীন কৃষকদের নাবার্ড মারফত সাহায্যদান পর্যন্ত আরও একগুচ্ছ সামাজিক প্রকল্প ঘোষণা করল। এইসব দান-খয়রাতির দায় মেটাতে মেটাতে মোদির বাজেট রাজকোষ ঘাটতি দাঁড় করালো ৪.২ শতাংশে, যা চিদাম্বরমের অন্তর্বর্তী বাজেটের চেয়েও কিছুটা বেশি। বিশেষজ্ঞরা যে ক্ষুব্ধ হয়েছেন তার সঙ্গত কারণ আছে বৈকি।

এখানেই ক্ষান্ত হলে তবুও এদের ক্ষেপে যাবার মতো অবস্থা হতো না। কিন্তু যে দুটি ক্ষেত্রে ভালো রকম সুবিধে পাওয়ার কথা ছিল সেখানেও প্রায় গালে চড় বসিয়ে দিল এই বাজেট। আমরা বিমা এবং ব্যাংকে সরকারি শেয়ার বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার দাবির কথা বলছি। বিমা ক্ষেত্রে বিলগ্নিকরণের মাত্রা ইকুইটির ২৬ শতাংশ থেকে বাড়ানো হলো বটে, তবে তা আটকে রইল ৪৯ শতাংশে। অর্থাৎ ৫১ শতাংশ শেয়ার থেকে

গেল সরকারের হাতেই। 'ইকনমিক টাইমস'-এর বিশেষজ্ঞ তো লিখেই দিলেন, ৫১ শতাংশের কম শেয়ার নিয়ে কোনো ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিই আর এদেশে বিমার ব্যবসায় নামবে না— এটা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন। জেটলির বাজেট যা করল তাতে শেষ পর্যন্ত বিমা ব্যবসা সরকারি হাতেই থেকে যাবে। সংস্কার আসলে কিছুই হলো না।

ব্যাংক বিলগ্নিকরণের ব্যাপারে সরকার যা করল সেটা আরও চমৎকার। সরকারি ব্যাংকের ইকুইটি বিক্রি করে বিলগ্নিকরণ করা হবে বটে, ২৯ শতাংশের জায়গায় ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত বিলগ্নিকরণও করা হবে, তবে এই ইকুইটি বিক্রিটা কোনো ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বা অন্য অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে করা হবে না, এই শেয়ার বিক্রি হবে খুচরো বাজারে, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মানুষদের কাছে খুচরোভাবে থাকবে এই শেয়ার। নিয়ন্ত্রণ তো সরকারের কাছেই থেকে যাবে, ৫১ শতাংশ ইকুইটি সরকারের হাতে থেকে যাবার দরুন। শুধু তাই নয়, মোটা অংকের শেয়ার কিনে কোনো কর্পোরেট ব্যাংকের ঋণদান পলিসির ব্যাপারে যে নাক গলাবে, সেটাও হবে না। কেন চটবেন না এই সংস্কারপন্থী বিশেষজ্ঞরা?

জাতীয় স্তরের বাঘা বাঘা বিশেষজ্ঞ থেকে তাদের পশ্চিমবঙ্গীয় মার্জার সংস্করণ— সবাই জানিয়েছেন, এ বাজেট ইউপিএ-২ এর বিজেপি সংস্করণ। ইউপিএ-২ এ যা যা থাকতে পারত তার সবই আছে, এবং তাতে আরও সংযোজন ঘটেছে এই বাজেটে। এতে বিজেপি-র মোড়ক লাগানো হয়েছে 'নমামি গঙ্গা', 'কাশ্মীরী পণ্ডিতদের বাস্তুচ্যুতির ক্ষতিপূরণ' এবং সর্দার প্যাটেলের মূর্তি বসানো আর সামাজিক প্রকল্পগুলিকে শ্যামাপ্রসাদ-দীনদয়াল উপাধ্যায় স্মরণে নামাঙ্কিত করার মধ্য দিয়ে।

মোদি কি সত্যই ইউপিএ-র মতো মধ্যপন্থা অবলম্বন করছেন, নাকি অন্য কিছু আছে এই প্রথম মোদি-বাজেটে? প্রথমেই বলা দরকার, ভাগবতী বা তাঁর মন্ত্রশিষ্য অরবিন্দ পানাগড়িয়া এমন একটা প্রেসক্রিপশন নিয়ে হাজির হয়েছেন, সারা পৃথিবী জুড়েই যে প্রেসক্রিপশনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বামপন্থীরাই শুধু এসবের বিরোধিতা করছেন, এমন নয়। কট্টর বাজারপন্থীরাও বুঝছেন, কোথাও একটা গোলমাল আছে এই শিকাগোপন্থী অর্থনৈতিক তত্ত্বে। টাকার বাজারে (অর্থাৎ লগ্নিপুঁজির বাজারে) যথেষ্ট যোগান থাকলেই পুঁজি বিনিয়োগের ঢেউ ওঠে, একথাটা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ব্যাংক টাকা নিয়ে বসে থাকলেও কোনো কর্পোরেট সে টাকা ছোঁবে না, যদি তারা মনে করে যে পণ্যের বাজারে যথেষ্ট ক্রেতা নেই, দাম কমালেও বিক্রি বাড়বে না। ২০০৮-এর মন্দা কাটাতে লগ্নির বাজারে কত অর্থই না ঢালা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে সস্তায় ঋণ দেওয়ার জন্য। কাঙ্ক্ষিত সুফল কিন্তু পাওয়া গেল না। লাতিন আমেরিকাকে গিনিপিগ করে এই শিকাগো তত্ত্ব কতভাবেই না গেলানোর পরীক্ষানিরীক্ষা হলো। কাজের কাজ এই হলো যে সেখানে শেষ পর্যন্ত শিকাগো তত্ত্বের জনক মিল্টন ফ্রিডম্যানের শিষ্য-প্রশিষ্যরা গলাধাক্কা খেলো। ভারতেও ২০০৮-এর পর ব্যাংকগুলোতে ক্যাশ টাকা পড়ে থাকল, বাজার না থাকায় কেউ সেটা স্পর্শ করল না, ব্যাংকগুলোকে প্রণব মুখার্জীর হাত ধরে সরকারি ঋণপত্রে বেশি বেশি বিনিয়োগ করে ধাক্কা সামলাতে হলো।

ক্ষমতায় পৌঁছে মোদিকেও এটা বুঝতে হয়েছে যে বাজার চাঙ্গা করার ওষুধ ভাগবতী-পানাগড়িয়ার প্রেসক্রিপশনে নেই, বাজার চাঙ্গা থাকলে কী করতে হবে সেটাই লেখা আছে ওখানে। বাজার চাঙ্গা করার জন্য ধরে রাখতে হবে কেইনসীয় নীতি— ক্রেতার হাতে টাকা পৌঁছে দেবার অস্ত্রগুলি প্রয়োগ করতে হবে বুদ্ধিমানের মতো। যে দেশি কর্পোরেটের হাতে সস্তায় অর্থ যোগানোর কথা বলছেন এই বিশেষজ্ঞরা, সেই কর্পোরেট এই টাকায় যে 'নন-পারফর্মিং অ্যাসেটে'র পাহাড় গড়বে এবং সেটা সামলাতে যে ঘন ঘন 'কর্পোরেট রেট রিস্ট্রাকচারিং' করতে হবে, মোদি সেটা গুজরাটে বসে বোঝেন নি, দিল্লীর ক্ষমতা কেন্দ্রে এসে বুঝেছেন বা বুঝতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁকে তাই ক্রেতার হাতে টাকা যোগানোর মতো সরকারি খরচ বাড়াতে হয়েছে— পরিকল্পনা খাতে জেটলির বাজেট গত বাজেটের চেয়ে টাকার অংকে যে প্রায় ২৬ শতাংশ বেশি খরচ করবেন, তার যুক্তিটা খুঁজতে হবে এইভাবে।

আন্তর্জাতিক বাজার চাঙ্গা না হলে কিংবা ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তার ও গভীরতার প্রসার না ঘটলে এদেশে বিদেশি পুঁজি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিনিয়োগ করতে আসবে না। ২০০২ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত এদেশে বেশ ভালো রকম বিদেশি পুঁজি এসেছিল, কারণ আন্তর্জাতিক বাজার চাঙ্গা ছিল, দেশি (উচ্চবিত্তের) বাজারও কিছুটা বেড়েছিল তার ফলে। এখন সে পরিস্থিতি নেই। কাজেই 'স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ'-কে চটিয়ে এখনই বিদেশি পুঁজিকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করার কোনো আশু প্রয়োজনীয়তা নেই। জেটলি তাই বিদেশি বিনিয়োগের অংশে তাঁর বক্তৃতা শুরুই করেছিলেন 'সিলেকটিভ' কথাটা দিয়ে। প্রতিরক্ষা উৎপাদনে (কামান বন্দুক গোলা বারুদ) বিদেশি বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৪৯ শতাংশে বাঁধা হয়েছে বটে, তবে তাতে বেশি কিছু জল্পনা কল্পনা করার নেই। কামান বন্দুকের খরচ মোদি বাড়াবেন পাকিস্তানকে চাপে রাখতে (কিছুটা চীনকেও), আর বিদেশ থেকে অস্ত্র কেনার টাকাপয়সা লেনদেনে যে কেচ্ছা লেগেই থাকে খুব সম্ভব সেটা সামলানোর জন্যই বিদেশিদের দিয়ে দেশের মধ্যে উৎপাদন

এর পর ৩৮ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

''সুদিন'' আসছে, কিন্তু দুর্দশা সহ

পরিচয় কানুনগো

''সিংহাসনে বসল রাজা বাজল কাঁসর ঘণ্টা/ছটফটিয়ে উঠল হঠাৎ মন্ত্রীবুড়োর মনটা''। শুধু মন্ত্রী কেন, অনেকেরই মন উচাটন হয়েছে। এই যে এবারে নির্বাচনে পালাবদল হলো, সেটা একেবারে অপ্রত্যাশিত না হলেও, যেভাবে সংসদে চূড়ান্ত একদলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো, তাতে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের সমর্থক ও কর্মীদের কপালে ভাঁজ পড়েছে। সংসদে শাসক দলের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ শ্রমজীবী মানুষের কাছে কখনও শুভ সংবাদ বহন করেনা। কারণও আছে।

সংসদীয় কক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে তাদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে যে খুব একটা পরিসর দেয়, তা নয়। পরিসর শ্রমজীবী মানুষকে নির্মাণ করতে হয়। আর সেই নির্মাণের ক্ষেত্র সংসদ নয়, সংসদ কক্ষের বাইরে বৃহৎ গণসংগ্রামের মঞ্চ। কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই নির্মাণের শরিক হয়ে যদি সংসদ কক্ষে আসন লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনতার কিছুটা পরিসর লাভের সুযোগ থাকে। গত দু-দশক ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষ কর্পোরেট পুঁজি বিরোধী, বিস্থাপন বিরোধী বেশ কয়েকটি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। সংগ্রামগুলি বিচ্ছিন্ন হলেও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং তীব্রতার নিরিখে সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ষোড়শ লোকসভা এইসব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠকে কোনো স্থান দেয়নি। বরং আশঙ্কা, বর্তমান মোদী সরকারের শ্রম বিরোধী কর্মসূচিগুলি ষোড়শ লোকসভার বিপুল অনুমোদন পাবে।

সমাজবিজ্ঞান কোনো আকস্মিককে স্থান দেয়না। নরেন্দ্র মোদীর উত্থান এবং বিজেপি-র নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাও আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি কীভাবে বিকশিত হচ্ছে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলি কী ভূমিকা নিচ্ছে, তার ওপরই নির্ভর করে সামাজিক গতিপ্রকৃতি। নরসীমা রাও সরকার ১৯৯১ সালে মনমোহন সিং-এর সহায়তায় ভারতে নয়া অর্থনৈতিক সংস্কার চালু করে। আর্থিক সংস্কারের সূচনার যুগেই ১৯৯২ সালে সংঘ পরিবারের উদ্যোগে সংঘটিত হয় বাবরি মসজিদ ধ্বংসকাণ্ড। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে লোকসভায় বিজেপি-র আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সেই প্রথম বিজেপি প্রধানমন্ত্রীর আসন দখল করে। ১৯৯৮ সালে এনডিএ সরকার গঠন করলেও এক বছর পরেই দ্বাদশ লোকসভা ভেঙ্গে যায়। এই স্বল্পকালের মধ্যেই ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে পরমাণু বোমা পরীক্ষার প্রতিযোগিতা এবং পরিণামে কারগিল যুদ্ধ দেশে এক অস্বাভাবিক যুদ্ধোন্মাদনা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। উগ্র জাতীয়তাবাদী পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে এনডিএ ১৯৯৯ সালে ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠন করে এবং পরিকল্পিত পথে 'উজ্জ্বল ভারত' শ্লোগানের আড়ালে ব্যাপক আর্থিক সংস্কারের পথ গ্রহণ করে। বিমা সংস্থায় বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ শুরু হয়, সরকারি টেলিকমিউনিকেশন সংস্থা টাটার হাতে তুলে দেওয়া হয়, বিদেশি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাধানিষেধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুলে দেওয়া হয়। জাতীয় সড়ক নীতি পরিবর্তন করে সড়ক পরিকাঠামো কর্পোরেট সংস্থার নিয়ন্ত্রনাধীন করা হয়। একদিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নির্দেশানুসারে পাঠ্যপুস্তকে, সরকারি গ্রন্থাবলীতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্গার শুরু হয়, অপরদিকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী আর্থিক ও কাঠামোগত সংস্কার চলতে থাকে।

২০০১ সালে গুজরাট ভূমিকম্পের পর গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাই প্যাটেল পদত্যাগ করেন। সংঘের নির্দেশে নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কয়েকমাস পরেই ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভয়াবহ গোধরা দাঙ্গায় কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয় এবং ব্যাপক সম্পত্তি ধ্বংস হয়। সারা দেশ যখন মোদী নিন্দায় মুখর, তখন বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে মোদী অকাল নির্বাচন আহ্বান করেন এবং সেই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহ বিজেপি-র বিজয় দেশবাসীকে একইসঙ্গে বিস্মিত ও বিমর্ষ করে। ধর্মীয় মৌলবাদের যে রাজনীতি মোদী গুজরাটে প্রতিষ্ঠিত করেন, এখনও গুজরাটে সেই রাজনীতিরই আধিপত্য চলছে।

গুজরাটে সফল হলেও ২০০৪ সালে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। 'উজ্জ্বল ভারতের' তাপে দগ্ধ মানুষ এনডিএ বিরোধী রায় দেয়। বিজেপি-র আসন সংখ্যা হ্রাস পায়। কংগ্রেস এবং ইউপিএ-র আসন সংখ্যা বাড়ে, কিন্তু তারাও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলনা। বামফ্রন্টের সমর্থনে ইউপিএ সরকার গঠন করে। ভারতে উদারনীতির পরিকল্পনাকার, বিশ্বব্যাঙ্ক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত কাছের মানুষ মনমোহন সিং-কে যে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হলো, সেটা একমাত্র সোনিয়া গান্ধীর 'অন্তরাত্মার আহ্বানের' কারণেই সম্ভব হয়েছিল, অঙ্কটা এতটা সরল নাও হতে পারে।

চার বছর পর বাম দলগুলি প্রথম ইউপিএ সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ২০০৯ সালে তৃণমূলকে সঙ্গী করে কংগ্রেস দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার গঠন করে।

কংগ্রেসের আসনসংখ্যা ১৪৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৬-তে দাঁড়ায়। ইউপিএ-২ সরকারের অন্যতম জোটসঙ্গী তৃণমূল দল বছর তিনেক একসাথে থাকার পর জোট ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে। দুই পর্বেই জোটসঙ্গী হারিয়েও কংগ্রেস অনেকগুলি বিতর্কিত বিল পাশ করাতে পেরেছে, যা বিজেপি-র সাহায্য ছাড়া সম্ভব ছিলনা। *সেজ* আইন, ইউএপিএ সংশোধনী বিল, খনি আইন, পেনশন বিল, পারমাণবিক সুরক্ষা বিল, নয়া ভূমি অধিগ্রহণ আইন, বহুমুখী খুচরা ব্যবসায়ে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ ইত্যাদি আইনগুলি প্রণয়ন বা সংশোধনে বিজেপি-র সায় প্রমাণ করে দিয়েছিল, নয়া উদারনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির ক্ষেত্রে বিজেপি বিরোধী ভূমিকা পালন করেনা। যে চারটি আইনকে ইউপিএ সরকারের মানবিক মুখ হিসাবে কংগ্রেস শিবির থেকে ব্যাখ্যা করা হয়— তথ্য জানার অধিকার আইন, জাতীয় কর্মসংস্থান আইন, বনাধিকার আইন এবং খাদ্য সুরক্ষা আইন— তার তিনটিই প্রণীত হয়েছিল প্রথম ইউপিএ সরকার জমানার প্রাথমিক পর্বে। আবার দেখা গেল সরকার যখন আর্থিক এবং কাঠামোগত সংস্কারে বেশি উদ্যোগী হয়ে উঠতে চাইছে, পুঁজি যখন আগ্রাসী ভূমিকায় সবরকম বাধা অপসারণে উদ্যত, ব্যাটন চলে যাচ্ছে বিজেপি বা এনডিএ গোষ্ঠীর হাতে।

২

'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট' বইতে হেরম্যান ও চমস্কি মিডিয়া প্রচারের দুটো দিক উল্লেখ করেছিলেন— ১) রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনের প্রধান নায়কগণ যে বিষয়ে সহমতে পৌঁছন, সে বিষয়ে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার করেন, জনতার যতই বিকল্পের চাহিদা থাকুক না কেন; ২) প্রচার মডেল এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস এটাই প্রতীয়মান করে যে নির্দিষ্ট বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং দলগুলির মধ্যে (সেই বিষয়ে) প্রতিযোগিতা নিবারণ করার ক্ষেত্রে যে শক্তির ভূমিকা থাকে, সেই শক্তিই মিডিয়া-অভিমত নির্মাণে কর্তৃত্ব করে এবং সেই বিষয়ে গণবিতর্ক ও জনমত বর্জন করে।

ভারতে যতগুলি জাতীয় এবং আঞ্চলিক দল সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তা সে বিজেপি, কংগ্রেস, বিজেডি, তৃণমূল, এআইডিএমকে যারাই হোক না কেন, তাদের মধ্যে 'চলতি কর্পোরেট উন্নয়নের' প্রশ্নে অন্তত কোনো দ্বিমত বা বিরোধ নেই। সিপিআইএম এবং তাদের সহযোগী বামপন্থী দলগুলিও কর্পোরেট স্টাইলের উন্নয়ন মডেলকেই মেনে নিয়েছে। নির্বাচনী ময়দানে রাজনৈতিক দলগুলি যখন পরস্পরের মুখোমুখি, তখন এই মৌলিক প্রশ্নে তাদের কোনো দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়না। কর্পোরেট শাসিত টিভি, সংবাদপত্র মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রশ্নে কোনো বিপরীত কণ্ঠকে আমল দেয়না। অনেকটা এই কারণে সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রচারে সামগ্রিকভাবে যেটা জায়গা পেয়েছে, তা হলো এই উন্নয়ন মডেলের দক্ষ পরিচালনা, গভর্নেন্স— যার সাথে আমজনতার মৌলিক চাহিদার কোনো সম্পর্ক নেই।

সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে মোদীকে মহিমান্বিত করতে বিজেপি-র প্রচার ব্যয় ৫০০০ কোটি টাকার সীমা ছাড়িয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। নিজেদের দলকে প্রাধান্য না দিয়ে প্রচারে বিজেপি হয়ে উঠেছিল মোদীর টিম। কর্পোরেট মুখপাত্ররা প্রকাশ্যে মোদীকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করে। গুজরাট মডেল আগামী ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মডেলের শিরোপা পায়। মনমোহন সিং-এর গুণমুগ্ধ অর্থনীতিবিদ জগদীশ ভগবতী পঞ্চমুখে মোদী মডেলের প্রশংসা শুরু করেন। আর্থিক এবং বৌদ্ধিক— উভয় দিক থেকে আনুকুল্য ও সমর্থন দিয়ে কর্পোরেট সেক্টর মোদী প্রতিষ্ঠায় মদত দেয়। মোদীর যে ছবি কর্পোরেট লালিত প্রচারে উপস্থাপিত করা হয়, তাতে গোধরা দাঙ্গা, গুলমার্গ সোসাইটি হত্যা, ইশরাত জাহান হত্যা, 'মাধুরী' অনুসরণ বিতর্ক— এত ঘটনার স্মৃতি মিডিয়া বেমালুম বিস্মৃত হয়। কাকতলীয় হলেও তাৎপর্যপূর্ণ, ১৬ মে, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার দিন, সুপ্রিম কোর্ট গুজরাটের 'অক্ষরধাম মামলা'র ছয় জন অভিযুক্তকে নিরপরাধ ঘোষণা করে মুক্তি দেয় এবং মন্তব্য করে যে, "এতগুলি মানুষের বহুমূল্য জীবন হরণের জন্য যারা দায়ী, সেইসব প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার বদলে পুলিশ নির্দোষ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ আরোপ করেছে, যার ফলশ্রুতিতে তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং দণ্ডাজ্ঞা জারি হয়েছে।" (Supreme Court Criminal Appeal No 2295-2296 of 2010, Adambhai Sulemanbhai Ajmeri & Ors Vs State of Gujarat)। সুপ্রিম কোর্টের এই গুরুতর অভিযোগ নিয়ে টিভি-তে কি কোন টক শো দেখা গেছে? না।

২০১১ সালেই মার্কিন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী মোদীকে 'উৎকৃষ্ট শাসন ও উন্নয়নের প্রতীক' হিসাবে সার্টিফিকেট দিয়ে ২০১৪ সালের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চিহ্নিত করেছিল (India: Domestic Issues, Strategic Dynamics, and U.S. Relations, Congressional Research Service, September 2011)। লিখিত বা অলিখিত নির্দেশে মিডিয়া সেই প্রচারটাই করে গেছে এবং ইউপিএ-র ব্যাটনটা তখন থেকেই এনডিএ-র হাতে চলে গেছে।

৩

বিজেপি-র রাজনীতির দুটি দিক আছে। একদিকে কর্পোরেট পুঁজির পৃষ্ঠপোষকতা। যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি দীর্ঘসময় ক্ষমতায় আছে, যেমন ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, সেই সব রাজ্যে, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ অপহরণ এবং কর্পোরেট লগ্নির পথে বাধা অপসারণে বিজেপি সরকারগুলি যে উগ্র ভূমিকা নিয়েছে, তা লগ্নিকারীদের নজর কেড়েছে। দ্বিতীয়,

আরএসএস, হিন্দু মহাসভা সহ মৌলবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা। বিজেপি-র সকল মুখ্যমন্ত্রী আরএসএস প্রশিক্ষিত এবং সংঘ নিয়োজিত। মোদী পরবর্তী গুজরাট মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী আনন্দীবেন প্যাটেল নিজে আরএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও তাঁর স্বামী আরএসএস প্রচারক। স্বাভাবিক কারণে বিজেপি-র রাজনীতি সংঘের "হিন্দু জাতীয়তাবাদের" ভাবনায় জারিত। আদবানীর নেতৃত্বে ১৯৯০ সালে রথযাত্রার মাধ্যমে সংঘ রাজনীতি সংগঠিত প্রচার পায়। পাশাপাশি সেই সময়কালে বিশ্বায়নের রথযাত্রা শুরু হয়।

ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই সময় থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্ব সংকট— স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী (নরসীমা রাও) বিধায়ক বেচাকেনার অভিযোগে জড়িয়ে পড়েন। দুর্নীতির কারণে এবং আর্থিক সংস্কার জনিত সঙ্কটের কারণে কংগ্রেস মানুষের আস্থা হারাতে শুরু করে। দ্বিতীয়ত, ভি পি সিং-এর সময় থেকে মন্ডল কমিশন বিরোধী আন্দোলন যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টি করেছিল, বিজেপি তার পুরো ফায়দা লুটতে শুরু করে। জাতিগত বিভাজনে বিজেপি ইন্ধন যোগায়। তৃতীয় কারণটি বোধ হয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক স্তরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত প্রভাবিত ইউরোপীয় ব্লক-এর দেশগুলির ভাঙ্গনের পর, ভারতবর্ষে সংসদীয় বামপন্থী দলগুলি দিশেহারা হয়ে পড়ে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পুঁজিবাদের পথে পরিভ্রমণ ভারতের বামপন্থী রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট বিশ্বায়নের অশ্বে সওয়ার হয়। ভারতবর্ষের গণসংগ্রামগুলিতে সংসদীয় দলগুলি কার্যত প্রাসঙ্গিকতা হারায়। এই শূন্যস্থানে সংঘ পরিবারের উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ পরিপুষ্টি লাভ করতে শুরু করে।

৪

নরেন্দ্র মোদীর উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি নিয়ে এনডিএ শরিকদের মধ্যেই একসময় প্রশ্ন উঠেছিল। নিজের দলের মধ্যেই মোদী বিরোধিতার সম্মুখীন হন। কিন্তু গুজরাটে ক্ষমতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে সাফল্য এবং সংঘ পরিবারের সমর্থন মোদীকে চালকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। মোদী নিজেকে যত না পার্টি-নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন তার থেকে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন জননেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি। ২০০৭ সালের নির্বাচনে মার্কিনী প্রচার সংস্থা এপিসিও ওয়ার্লডওয়াইড ছিল মোদীর প্রচার সহায়ক এবং প্রচার উপদেষ্টা। ঐ মার্কিন সংস্থাই মোদীকে ঝড়ের গতিতে প্রচার চালানোর উপদেশ দেয়, অবশ্যই অর্থচুক্তির বিনিময়ে (সূত্র- Gujarat Elections: The Sub-Text of Modi's 'Hattrick'— High Tech Populism and the Neo-middle Class', Christophe Jaffrelot)। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনেও ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মোদী একই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। মৌলবাদের রথে চেপে উদারনীতিবাদের জয়গান— মানুষকে সাঁড়াশির মতো দুদিক থেকে চেপে ধরেছে।

২০১৪ সালের সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনোত্তর জনমত সমীক্ষায় (লোকনীতি-ন্যাশনাল ইলেকশন সার্ভে) দেখা যাচ্ছে, বিজেপি প্রায় নিরঙ্কুশ সমর্থন পেয়েছে উচ্চ বর্ণের। অন্যান্য পশ্চাৎপদ বর্গ (ওবিসি) এবং দলিত বর্গের এক বৃহৎ অংশের সমর্থনও বিজেপি আদায় করেছে। সমর্থন পায়নি আদিবাসী এবং মুসলিম জনসাধারণের। উত্তরপ্রদেশে উচ্চবর্ণ ভোটের ৭৫ শতাংশ, বিহারে ৭৮, কর্নাটকে ৬২, কেরালায় ২৯ শতাংশ ভোট বিজেপি-র অনুকূলে যায়। উত্তর প্রদেশে পশ্চাৎপদ বর্গের ভোটের ৪৭ শতাংশ, দলিত ভোটের ৩১ শতাংশ, বিহারে যথাক্রমে ৩৩ ও ৫০ শতাংশ ভোট বিজেপি জোটকে সমর্থন জানিয়েছে (*দি হিন্দু*, ২৩ মে ২০১৪)। তবে "বিজেপি-র দলিত ভোটের ভিত্তি প্রধানত ক্রম-উন্নতিশীল শহুরে, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, মিডিয়া প্রচারেও যারা যথেষ্ট আলোকিত" (*দি হিন্দু*, ৬ জুন ২০১৪)। দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্গের মানুষের মধ্যে মেরুকরণ ঘটে গেছে এবং সেই মেরুকরণটা হয়েছে খাড়াখাড়ি।

৫

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নয়া এনডিএ সরকার-এর আস্তিনে কী কী সিদ্ধান্ত গুটিয়ে রাখা আছে, তার অল্প-স্বল্প প্রকাশ পেয়েছে, অধিকাংশই আস্তিনের নীচে। উত্তরপ্রদেশ, আসামে দাঙ্গার পথ বেয়ে, পশ্চিমবাংলায় সংখ্যালঘু বিতাড়নের উত্তেজনা ছড়িয়ে, যখন যেমন প্রয়োজন ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমতায় আরোহণ। ক্ষমতায় এসে যে কোনো সরকারের প্রথম প্রচেষ্টা থাকে ভাবমূর্তি নির্মাণের। মোদী সরকারও তার ব্যতিক্রম নন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নরেন্দ্র মোদীর আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি নির্মানের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সকলের নজরে পড়েছে। প্রথম ক্যাবিনেট মিটিঙে কালো টাকা উদ্ধারে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করার সিদ্ধান্তে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর বাইরেও তো বেশ কিছু কর্মকাণ্ড ঘটতে শুরু করোছ, যা আগামী দিনে এক ব্যাপক অস্থিরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের অন্যতম প্রতিমন্ত্রী এবং উধমপুর থেকে নির্বাচিত এমপি জিতেন্দ্র সিং, প্রথমবার লোকসভায় পা দিয়েই জানিয়ে দিলেন, সংবিধানের ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির জন্য বিজেপি "সংশয়ীদের" প্রত্যয়ী করার চেষ্টা চালাবে। বিজেপি "অত্যন্ত পেশাদারী" মনোভাব নিয়ে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং উপত্যকায় সভা ডাকতে চলেছে। আরএসএস মন্ত্রীর মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছে। বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার পর জিতেন্দ্র সিং তার বক্তব্যের "অপব্যখ্যা" করা হচ্ছে বলে সাফাই দিলেও এটা পরিষ্কার, বিজেপি এবং আরএসএস তাদের পুরানো এজেন্ডা অনুসরণ করেই চলেছে। কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন, সামরিক আইন প্রত্যাহার, কাশ্মীরী যুবকদের অন্তর্ধান রহস্য তদন্ত— এর কোনো কিছুই শাসক দল বা

সরকারের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়। (কংগ্রেসেরও ছিল না)। ৩৭০ ধারাই কি কাশ্মীর সমস্যার একমাত্র সমাধান? নাকি এর অন্তরালে আছে এক গূঢ় অভিসন্ধি?

মোদী মন্ত্রীসভা শপথগ্রহণের কয়েকদিন পরেই, ২ জুন পুনাতে যে ঘটনাটি ঘটে, তা প্রকৃতই আশঙ্কার উদ্রেগ করে। ফেসবুকে কেউ বা কারা শিবাজী এবং বাল থ্যাকারের মানহানিকর ছবি পোস্ট করেছিল। প্রকৃত দোষীকে চিহ্নিত না করে শুধুমাত্র ভিন্নধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে হিন্দু রাষ্ট্রসেনার সদস্যরা মহসীন শেখকে পুনায় পিটিয়ে মেরে ফেলে। ঘটনাটাকে বিচ্ছিন্ন কাণ্ড ভাবা ঠিক হবেনা। উগ্র ধর্মান্ধতার যে পরিবেশ দেশজুড়ে সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চলছে, মহসীন তারই বলি। ১৯৯৯ সালে উড়িষ্যায় গ্রাহাম স্টেইনকে সপরিবারে হত্যা, ২০০৭ সালে সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা বিস্ফোরণ, ২০১৪ সালে মহসীন হত্যা— ভিন্ন ভিন্ন নামের আড়ালে একই শক্তির মদমত্ততার প্রকাশ।

সংবেদনশীল অপরাধমূলক কার্যকলাপের কারণে প্রশাসনের যে সব স্থানে মোদী-বাহিনীর দুর্বলতা আছে, সেই সব স্থানে অনুগতদের নিয়োগ করে এবং ঋজু ব্যক্তিদের অপসারণ করে, কেন্দ্রে ও গুজরাটে নয়া সরকার অপরাধগুলিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রচলিত নিয়মরীতি ভঙ্গ করে, মোদী সরকার সুপ্রিম কোর্ট প্রস্তাবিত বিচারক নিয়োগ তালিকা থেকে প্রাক্তন সলিসিটর জেনারেল গোপাল সুব্রহ্মনিয়মের নাম ছাঁটাই করে দিয়েছে, কারণ গুজরাটের সোহরাবুদ্দিন মামলায় সুব্রহ্মনিয়ম স্ব-নিযুক্ত উকিল (amicus curiae) হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর তৎপরতায় নরেন্দ্র মোদীর অত্যন্ত কাছের মানুষ ও তৎকালীন গুজরাট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে পদত্যাগ করতে এবং জেল খাটতে হয়েছিল। যে বিচারক সিবিআই কোর্টে মামলাটির শুনানি গ্রহণ করছিলেন, তাঁকেও গত ২৬ জুন বদলি করা হয়েছে। ইসরাত জাহান ভুয়ো সংঘর্ষ ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার জি এস সিংঘাল-এর সাসপেনশন আদেশ তুলে নিয়ে পুনর্বহাল করা হয়েছে।

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী Christophe Jaffrelot মোদী সরকারের অভিমুখ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "মোদীর প্ল্যান এ হলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য এবং যদি তা কাজ না করে, হিন্দুত্বের রাজনীতিতে জোর দেওয়া হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যান বি"। অর্থাৎ মোদীর আশু লক্ষ্য, সমস্ত শ্রমজীবী এবং প্রান্তিক মানুষদের বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে ব্যবসায়ী-লগ্নিকারীদের জন্য সমস্ত দ্বার উন্মোচন (প্ল্যান এ)। এর ফলে উদ্ভূত অবশ্যম্ভাবী সামাজিক অসন্তোষ ঠেকাতে কিংবা উন্মেষিত গণ-বিক্ষোভে লাগাম পরাতে, শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভাজন এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে প্রযুক্ত হবে প্ল্যান বি। মন্ত্রীসভার সদস্যদের কাছে প্রেরিত নোটে প্রধানমন্ত্রী ১০০ দিনের অগ্রাধিকারের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে প্রথমেই আছে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে সমস্ত বাধা অপসারণ, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সংস্কারে গতি আনা, লগ্নি আকর্ষণ করা ইত্যাদি। এনডিএ সরকার প্রথম রেল বাজেটেই রেল পরিবহনে বিদেশি পুঁজি লগ্নির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সাধারণ বাজেটে প্রতিরক্ষা ও বীমা ব্যবসায়ে বিদেশি পুঁজির হার ৪৯ শতাংশ করা হয়েছে। এই সরকার এফডিআই সরকার। বিজেপি-র ম্যানিফেস্টোয় ব্যাংক, শিক্ষা, শ্রম সংস্কারের ঘোষণা আছে। ইতিমধ্যেই ছাঁটাইয়ের সুবিধার্থে এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থে 'শিল্পবিরোধ আইন', 'কারখানা আইন', 'চুক্তি শ্রমিক আইন' ইত্যাদি সংশোধনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। পূর্বসূরী কংগ্রেস কাজ অনেকটাই এগিয়ে রেখে গেছে। ইউপিএ জমানায় গঠিত ব্যাঙ্ক সংস্কারের 'নায়েক কমিটি'র রিপোর্ট ইতিমধ্যেই জমা পড়ে গেছে এবং রিপোর্টে যথারীতি ব্যাংক বেসরকারিকরণের দাওয়াই দেওয়া হয়েছে। বাজেটে এনডিএ সরকার ব্যাংক বেসরকারিকরণের জন্য শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট পুঁজি বিনিয়োগের নীতি আগেই গৃহীত হয়েছে। ৯ জুন সংসদের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণে 'একান্তভাবে মালবাহী সড়ক'-এর (dedicated freight corridor) দুপাশে 'বিশ্বমানের শিল্প বিনিয়োগ অঞ্চল' গঠনের যে ঘোষণা করা হয়েছে, তা ইউপিএ ঘোষিত 'জাতীয় শিল্প উৎপাদন অঞ্চল" (National Manufacturing & Investment Zone) থেকে পৃথক কিছু নয়। কৃষিক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে, "জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি" প্রণীত হবে— যার মূল কথা সাধারণ মানুষের জমি কর্পোরেট হস্তে সমর্পণ। ইউপিএ আমলে জমি অধিগ্রহণের যে নয়া আইন চালু হয়েছিল, তা আরও কর্পোরেটমুখী করতে সংশোধন করা হবে। তেলেঙ্গানা অঞ্চলে পোলাভারাম বাঁধ প্রকল্পে তেলেঙ্গানা সরকারের বিরোধিতার জন্য সদ্য গঠিত তেলেঙ্গানা রাজ্য থেকে সাতটি মণ্ডলকে অন্ধ্রের হাতে তুলে দেওয়া হলো। ওবামাকে খুশি করার জন্য নয়া সরকার ভারতের পরমাণু কেন্দ্রগুলি আন্তর্জাতিক পরমাণু কমিশনের নিকট উন্মুক্ত করে দিল। ওবামাও মোদীকে কাছে টেনে নিতে সময় নেয়নি।

বহুমুখী খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ, জিএম শস্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখনই কোনো ছাড় দেওয়া হচ্ছেনা বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কত দিন? বিপুল অর্থব্যয় করে যারা বর্তমান সরকার গঠনে মদত দিল, তারা কি তাদের পাওনাগণ্ডা ছেড়ে দেবে?

অনেকে হয়তো নতুন সরকারকে কিছুটা সময় দেওয়ার, আরও কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করার কথা ভাবছেন। যেমনটা হয়ে থাকে। ভাবুন। আরএসএস কিন্তু বসে নেই। সামনে 'সুদিন' আসছে ঠিকই, তবে সেটা বিত্তশালীদের জন্য। বিত্তহীনদের দুর্দিন কেউ ঠেকাতে পারবে না, যদি না তারা নিজেরা ফুঁসে ওঠে।

প্রবন্ধ

কৃষি জ্ঞান-উদ্যোগ : জনস্বাস্থ্যে আক্রমণ

সমরেশ মিত্র

২০০৬ সালে চুক্তিবদ্ধ হলেও কৃষি জ্ঞান-উদ্যোগ নিয়ে ভারত সরকার আজও সক্রিয়। এই উদ্যোগের বিপদ যখনই মানুষ বুঝতে শুরু করেছে, তখনই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্যোগটি তার সর্বনাশা রূপকে দৃষ্টির অন্তরালে রাখার জন্য নতুন নতুন নাম গ্রহণ করেছে। বিশ্বায়নের ফেরিওয়ালারা তাদের পণ্যে বৈচিত্র্য বাড়ানোর উদগ্র তাগিদে এই কৃষি জ্ঞান-উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত 'কৃষি' শব্দটির আওতায় বহুধা-বিস্তৃত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

কৃষি জ্ঞান-উদ্যোগ হলো বিশ্বায়নের রাজনীতি-অর্থনীতি রূপায়ণের একটিমাত্র দিক। অন্যান্য দিকগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাত্রায় রূপায়িত হয়ে চলেছে।

এই জ্ঞান-উদ্যোগের যে পরিব্যাপ্ত পরিসর রয়েছে, আলোচনার জন্য তার মধ্যে থেকে আমরা বেছে নেব কেবল জনস্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য পঠন-পাঠন-এর মতো কয়েকটি মাত্র দিক। বিশ্বায়নের বিভিন্ন ধাপ একে অপরটির সম্পূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই প্রক্রিয়া এক সম্পূর্ণ আদর্শের রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে জ্ঞান আহরণের মতো আপাত নিরামিষ শব্দের ছদ্মবেশে।

গ্যাট চুক্তির সঙ্গে অন্য একটি পরিপূরক সমঝোতা চুক্তি হয়— যেটির নাম জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস বা গাট্স। সাদা বাংলায় বললে পরিষেবা বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ সমঝোতা। এই সমঝোতার আসল অর্থ হল যে এখন থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নাগরিক সুবিধা সংক্রান্ত পরিষেবাকে 'বাণিজ্যিক পণ্য' হিসেবে গণ্য করতে হবে। এই সব পণ্যের ব্যবসা চলবে 'বাজারের নিয়মে'— অর্থাৎ পণ্যের মূল্য এবং বাণিজ্যের অন্যান্য বিষয়গুলি নির্ধারিত হবে গ্যাট-এর শুল্ক সংক্রান্ত সমঝোতা মারফত। এই সমস্ত পরিষেবা আর ভারত রাষ্ট্রের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক এবং নাগরিক মৌলিক অধিকারের বিষয় থাকছে না। এখন থেকে 'কল্যাণকর রাষ্ট্র'-র কাছ থেকে নগদ কড়ি গুণে এই সমস্ত মৌলিক পরিষেবা 'কিনতে' হবে। ভারত সরকার, বলাই বাহুল্য, এই গাট্স চুক্তিরও অংশীদার। তারা এই চুক্তির বিভিন্ন ধারা মোতাবেক কাজও শুরু করে দিয়েছে সেই ইউপিএ-১ সরকারের আমল থেকেই। শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের তালিকার বাইরে নিক্ষেপ করার প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনের কেবল শেষ ধাপটি বাকি। ধরেই নেওয়া যায় যে ভগ্নপ্রায় ইউপিএ-২ জোটের সক্রিয় সহযোগিতায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মোদি সরকার নিশ্চিন্তে সেই শেষ ধাপটি পেরিয়ে যাবেন। শেষ ধাপটি বাকি থাকতেই শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় স্বশাসিত সংস্থায় স্বায়ত্বশাসন বিলুপ্ত। সংসদে বিল এসেছে, শিক্ষাকে পরিষেবা হিসেবে মান্যতা দিয়ে 'শিক্ষা-পণ্য'-র জন্য 'ক্রেতা সুরক্ষা' নিশ্চিত করার।

স্বাস্থ্য নিয়ে ভারতের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক ও নীতি নির্ধারক সংস্থা, মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারি আমাদের এই 'স্ক্যাম রিপাবলিক'-এর সবচেয়ে শিহরণ-জাগানো কেলেঙ্কারিকেও হার মানিয়েছে। এই সংস্থার চেয়ারম্যান দুর্নীতি এবং আর্থিক নয়ছয়, উৎকোচ গ্রহণ-এর কারণে অভিযুক্ত হন। এই সমস্ত বিষয়ে অভিযোগের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর তাঁকে সর্বোচ্চ আদালত হাজতে পাঠায়। কিন্তু তাঁকে হাজতমুক্ত করে স্বপদে ফিরিয়ে আনার জন্য চাপ বাড়তে থাকে। বিশেষত দেশি-বিদেশি ফার্মা কম্পানিগুলির প্রবল চাপের মুখে ভারত সরকার পিছু হটে। তিনি যথারীতি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার স্বপদে বহাল হন। এই বিষয়টি পরে আবার আলোচনায় আসবে।

শহরে বা গঞ্জে যে সমস্ত প্রান্তিক মানুষরা উচ্ছেদ হয়ে বা বেকারির তাড়নায় বস্তিবাসী হয়েছেন, তাঁরা এমনিতেই নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে তাঁদের কাছ থেকে বিশ্বায়নের শর্ত মেনে বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত হারে এক্ষুনি বর্ধিত পুরকর, পরিষেবা কর, জল কর, শিক্ষার জন্য সেস্ ইত্যাদি আদায় করা কার্যত অসম্ভব। তাই কর্তাব্যক্তিরা এক নতুন খুড়োর কল বের করেছেন, যার পেছনে নাগরিকদের এক বিরাট অংশকে ছুটতে বাধ্য করা যাবে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এমন খুড়োর কল হলো বাধ্যতামূলক জাতীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক 'পরিষেবা'। এই কাজগুলির জন্য আন্তর্জাতিক অর্থদান সংস্থা এবং তাদের অনুদান প্রাপ্ত এনজিও-দের ভারতে জনস্বাস্থ্য বিষয়টি ব্যবস্থাপনার জন্য ইউপিএ-২ সরকার ঢালাও সুবিধে দিয়েছে।

নাগরিকদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সুস্বাস্থ্য প্রদানের অঙ্গীকার করে সরকার কীভাবে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে পরিষেবার জন্য মূল্য আদায়-এর অনুকুল পরিস্থিতি তৈরি করছে আমরা এখন সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। সরকার এই সমস্ত অনুদান প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে তথাকথিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে। এই সমস্ত এনজিও মূলত বেসরকারি ব্যবসায়িক সংস্থাগুলোর পরিবর্ত হিসেবে ভারতে কাজ করছে। কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক উদাহরণের মাধ্যমে আমরা আমাদের এইসব বক্তব্যগুলি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব। অসংখ্য উদাহরণের মধ্য থেকে আমরা পৃথিবীর অন্যতম

বৃহৎ বেসরকারি অনুদান সংস্থা বিল অ্যান্ড মালিন্ডা গেট্স ফাউন্ডেশনকে বেছে নিয়েছি।

এই আর্থিক অনুদান সংস্থাটির জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার কোনো অভিজ্ঞতা নেই! ভারতে বিল গেট্স সংস্থার কর্ম পদ্ধতি এইরকম : এই ফাউন্ডেশন যে পদ্ধতিতে ভারত সরকারের সঙ্গে 'সহযোগিতা' করে, সেই প্রক্রিয়ার তারা নাম দিয়েছে 'পিডিপি'— যা আমাদের অতি-পরিচিত 'পিপিপি' মডেল-এর রকমফের মাত্র। এই 'পিডিপি'-এর মূল বিষয় 'সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব'। অবশ্য এই 'অংশীদারত্ব'-তে জড়িত আর্থিক এবং অন্যান্য ঝুঁকি এবং দায় ভারত সরকারের, আর বেসরকারি 'অংশীদার', এক্ষেত্রে বিল গেট্স ফাউন্ডেসনের অনুদান প্রাপ্ত সংস্থাগুলি, পাবে আর্থিক মুনাফার প্রায় পুরো অংশটি সহ বিনা ভাড়ায় সরকারি সম্পত্তি ও পরিকাঠামো ব্যবহারের বল্গাহীন অধিকার। এইবার আমরা দেখি এহেন 'পিডিপি'-র মাধ্যমে গেট্স ফাউন্ডেশান কীভাবে ভারতে কাজ করা শুরু করেছে!

গেট্স সংস্থার বিস্তৃত জাল

ইন্টারন্যাশনাল এইড্স ভ্যাকসিন ইনিসিয়েটিভ নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে গেট্স ফাউন্ডেশন প্রচুর আর্থিক অনুদান দিয়েছে। এই সংস্থার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত রয়েছে ভারত সহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। ভারতে তাদের কাজের ক্ষেত্র হলো ফার্মা কম্পানিগুলি, বায়োটেকনলজি সংস্থাসমূহ এবং ভারত সরকারের সঙ্গে এইসব কোম্পানি এবং সংস্থাগুলির 'সহযোগিতার' পথ প্রস্তুত করা। বস্তুত কৃষি জ্ঞান-উদ্যোগ এই বিষয়ে 'ইনস্টিটিউশনাল মেকানিজম' বা সংস্থাগত প্রক্রিয়া নির্মাণের যে নিদান দিয়েছিল, এটি তার থেকে একেবারেই আলাদা নয়। এই ইনিসিয়েটিভ-এর মাধ্যমে ভারত সরকার যতটা অনুদান সরাসরি গ্রহণ করেছে, তার একটি অংশ তারা খরচ করছে সরকারি শিক্ষা এবং গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে, ইনিসিয়েটিভ-এর নির্দিষ্ট করে দেওয়া বিষয়গুলিতে গবেষণা চালানোর জন্য। কৃষি জ্ঞান-উদ্যোগের অন্যতম মূল বিষয়ও এই 'অনুসারী গবেষণা চালানো'। মূলত টীকা এবং রোগ-জীবাণু ধ্বংসকারী রাসায়নিক কীটনাশক এবং জিন-প্রযুক্তি জাত পণ্য উদ্ভাবন করাই এই ইনিসিয়েটিভ-এর অন্যতম লক্ষ্য।

ভারতে কর্মরত গেট্স ফাউন্ডেশন-এর অন্য একটি অনুদান প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা হলো পিডিপি ইনোভেটিভ ভেক্টর কন্ট্রোল কনসোর্টিয়াম। এই সংস্থার কাজ নির্দিষ্ট হয়েছে জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে 'ভেক্টর' নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন জাতের রাসায়নিক কীটনাশক উদ্ভাবন এবং সেই উদ্ভাবিত পণ্যটিকে বাজারজাত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। ('ভেক্টর' হলো রোগ-বীজাণুর বাহক যেমন মশা, মাছি ইত্যাদি)। বাজারজাত করার মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন বহুজাতিক কৃষিপণ্য সংস্থা, বেয়ার ক্রপ সায়েন্সেস নামক বহুজাতিক সংস্থার প্রাক্তন সিইও। ইনি এই উদ্যোগে যোগ দেওয়ার জন্য বেয়ার সংস্থা থেকে পদত্যাগ করে এই পিডিপি-তে যোগ দিয়েছেন। এই বেয়ার সংস্থা সম্পর্কে দু-একটি কথা না বললেই নয়। এই জার্মান সংস্থাটি হিটলারকে তার ইহুদি নিধন যজ্ঞে বিষবাষ্প সরবরাহ করত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে এই সংস্থাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিষবাষ্প উৎপাদনের কারখানাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়। এই সংস্থার উৎপাদিত নানান কীটনাশক ও অন্যান্য বিষ উৎপাদনের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ, বেয়ার সংস্থার নানান কীটনাশক ও অন্যান্য পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আজও বজায় রেখেছে। এবং, ঠিকই ধরেছেন, এই বেয়ার সংস্থা এই 'ভেক্টর কন্ট্রোল কনসোর্টিয়াম'-এর একজন অংশীদার!

কিন্তু ভারত সরকার মনে করে যে এই কনসোর্টিয়াম একটি ''স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যার মুখ্য উদ্দেশ্য জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা প্রদান এবং এই সংস্থাটির আর্থিক মুনাফা করার কোনো উদ্দেশ্য নেই।'' ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এই পিডিপি সংস্থাটি ভারতে 'জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জনসেবা প্রদানের জন্য' তার জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত পণ্যগুলির জন্য ভারতে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের অনুমতি আদায় করবে। পরবর্তী ধাপে ভারতের জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলিতে এই পণ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। বলাই বাহুল্য, এই পণ্যের অনেকগুলিই বেয়ার সংস্থার পুরোনো পণ্যগুলির রকমফের, যেগুলির ওপর ভারত সহ বিশ্বের বহু দেশে আজও নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। ভারত সরকার আরও মনে করে যে, যে সব ক্ষেত্রে 'মুনাফার সুযোগ না থাকায় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি লগ্নি করে না', এই কনসোর্টিয়ামটি সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই তাদের পণ্য উৎপাদন ও বিপণন সীমাবদ্ধ রাখবে। ভারত সরকারের সঙ্গে এই কনসোর্টিয়াম-এর চুক্তির শর্ত এটাই। এই চুক্তির পাশাপাশি ভারত সরকার গেট্স ফাউন্ডেশনের অন্য একটি অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থা, বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ-কে আবার এই সমস্ত 'মুনাফার সুযোগ না থাকা' ক্ষেত্রগুলিতে 'মুনাফার সুযোগ খুঁজে বার করার' জন্য সমীক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে। পাশাপাশি এই প্রসঙ্গে আরও একটি চুক্তি করে বলেছে যে, যদি মুনাফার ক্ষেত্র খুঁজে বের করা যায়, তবে যে সব সংস্থা ''মুনাফার উদ্দেশ্য ছাড়াই'' এইসব ক্ষেত্রে লগ্নি করবে, সেই সব সংস্থাকে মুনাফার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ভারত সরকার সচেষ্ট হবে!

বলা বাহুল্য 'মুনাফার সুযোগ নেই' এমন ক্ষেত্রগুলিতে প্রতিযোগিতা ছিল না। তাই ভারত সরকার মুনাফার সুযোগ করে দেওয়া জন্য 'সচেষ্ট' হওয়ার কথা ঘোষণা করা মাত্রই এই প্রক্রিয়া থেকে সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে গেট্স ফাউন্ডেশনের আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা', ম্যালেরিয়া ভ্যাকসিন ইনিসিয়েটিভ। এরা আবার গাঁটছড়া

বেঁধেছে মার্কিন সরকারি সাহায্যদান সংস্থা ইউএসএইড-এর সঙ্গে। যে পিডিপি-র মাধ্যমে এই ইনিসিয়েটিভ-টি কাজ করবে, সেই পিডিপি-র একমাত্র কাজ হল ভারত সরকারের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে গেট্স ফাউন্ডেশন-এর বিভিন্ন পিডিপি-র বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রভাবিত করা। এই চাপ সৃষ্টিকারী লবিটির প্রভাবে সম্প্রতি মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার কলঙ্কিত চেয়ারম্যানকে কারামুক্ত করিয়ে পুরোনো পদে পুনর্বহাল করিয়েছে— যে চেয়ারম্যানের ঘুষ নেওয়া সহ আরও দুর্নীতির কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এখানেই গল্পের শেষ নয়। এই চেয়ারম্যানটি সম্প্রতি ভারতের মেডিক্যাল এথিক্স কমিটির হর্তাকর্তা হয়ে বসেছেন এবং ভারতে বিভিন্ন টীকা এবং ওষুধের জন্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

টীকা এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পণ্যগুলি গুণমান বিচারের পর সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ভিত্তিক দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া রয়েছে, 'স্বেচ্ছাসেবা'-র দোহাই দিয়ে এবং এথিক্স কমিটির প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেই সব প্রক্রিয়া বাতিল করার জন্য গেট্স সংস্থার পিডিপি-র সুপারিশ মেনে সরকার কার্যত এই বহুপরীক্ষিত প্রক্রিয়াটি এড়িয়ে গেছে। ম্যালেরিয়ার-র টীকা ও 'স্বেচ্ছাসেবা'-র সম্পর্কটির একটি ইতিহাস রয়েছে যার চর্চা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন আমাদের মতো উষ্ণমণ্ডলের দেশগুলোর ওপর রাজনৈতিক এবং সামরিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষের প্রতিরোধ ছাড়াও উষ্ণমণ্ডলের জীবাণুরাও তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সামিল হয়। শীতমণ্ডলের ভাগ্যান্বেষী এই সমস্ত ইউরোপীয় মানুষদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা এইসব বীজাণুর আক্রমণাত্মক ক্ষমতা নিরূপণ, তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সামরিক বাহিনীর আর্থিক সহায়তায় কলকাতায় উষ্ণমণ্ডলের বীজানু সংক্রান্ত গবেষণাকেন্দ্র 'স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন' স্থাপন করে। কলকাতায় রোনাল্ড রস্-এর ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণা অজানা নয়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যখন আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার পাশাপাশি ইন্দোচীন, ফিলিপিনস ইত্যাদি দেশে মার্কিন সেনা পাঠাতে লাগল, তখন তাদের শ্বেতাঙ্গ সেনারাও এই সমস্ত উষ্ণমণ্ডলীয় জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে শুরু করল। পথ-প্রদর্শক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা এই সব জীবাণুর হাত থেকে মার্কিন সৈনিকদের রক্ষা করার জন্য 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনসন' বা সিডিসিপি নামক একটি মার্কিন চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে। এখন আবার মার্কিন দেশের প্রয়োজন ম্যালেরিয়া প্রতিরোধকারী একটি শক্তিশালী টীকা। কিন্তু এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ গবেষণার ফলে উদ্ভাবিত টীকা-র কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য প্রয়োজন মানুষের ওপর সেই টীকার প্রয়োগ করে চতুর্থ দফার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালানোর। এর জন্য মার্কিন দেশে উৎসুক রোগী পাওয়া দুরূহ। মার্কিনরা এখন এই পিডিপি-র মাধ্যমে সেই সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে।

গেট্স ফাউন্ডেশন এবং ইউএসএইড, সিডিসিপি-র সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ব্রিটেনের সরকারি অনুদান সংস্থা ডিএফআইডি। অন্যান্য সহযোগীবৃন্দ যথাক্রমে বেয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল, ফাইজার, গ্ল্যাক্সো স্মিথক্লাইন নামক বহুজাতিক সংস্থা— এরা সবাই মিলে একটি পিডিপি সংস্থা, ফ্যামিলি হেল্থ ইন্টারন্যাশনাল নাম দিয়ে খুলে বসেছে। এই সংস্থা একটি ম্যালেরিয়া-র টীকার কার্যকারিতা ভারতীয় নাগরিকদের ওপর পরীক্ষা করবে। তারা এই গবেষণার ফলাফল বিচার করবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দিয়ে, ভারতীয় কেন্দ্রীয় গবেষণাগারগুলির পরিকাঠামো নিখরচায় ব্যবহার করে।

পিডিপি-র পক্ষে সাফাই গাওয়ার লোক না থাকলে ভারতীয় নাগরিকরা যে এই অনাচার মেনে নেবে না তা ভারত সরকার জানে। ঠিক যেমন বিদেশে প্রশিক্ষিত কৃষিবিজ্ঞানীরা 'সবুজ বিপ্লব'-এর জয়গানে গলা মেলানোর পরই কৃষিতে সবুজ-বিপ্লব প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটল, ঠিক তেমনি অপ্রমানিত, মুনাফার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত স্বাস্থ্যপণ্যগুলিকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রয়োজন এমন 'ভারতীয় বিশেষজ্ঞ'দের, যারা এইসব পণ্যগুলির জয়গানে সরব হবে।

ভারত সরকার বিল গেট্স ফাউন্ডেশন থেকে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার অনুদান নিয়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের জন্য সারা দেশে প্রচুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে চলেছে। এই

> বিল গেট্স ফাউন্ডেসন-এর অনুদানপ্রাপ্ত যে সমস্ত সংস্থা ভারতে টীকাকরণ চালাচ্ছে, সেইসব টীকা-র ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সংক্রান্ত ছাড়পত্র পাওয়ার আগেই, যাদের ওপর এই টীকাকরণ পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে তাঁদের, তাঁদের সম্মতি না নিয়েই তাঁদের গিনিপিগ করা হয়েছে। বিল গেট্স সংস্থার অনুদানপ্রাপ্ত একটি পিডিপি ভারত সরকারকে প্রভাবিত করে এই বেআইনি কাজটি করার ছাড়পত্রও আদায় করেছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।
>
> অপ্রমাণিত টীকা, ওষুধ এবং চিকিৎসা প্রণালীর পরীক্ষামূলক ও পর্যবেক্ষণ-মূলক প্রয়োগের ফলে ২৫৪ জন মহিলা ইতিমধ্যেই মারা গেছেন। আরও ৩৯০০ জন নানান দীর্ঘকালীন অনারোগ্য রোগের শিকার হয়েছেন। টীকা প্রস্তুতকারীরা এঁদের যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণও দেয়নি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি প্রশ্ন করেছেন, এই পরীক্ষার যাঁরা উদ্যোক্তা, তাঁরা কেন এঁদের ক্ষতিপূরণ দেবেন না? এই ট্রায়ালের ফলে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের কষ্ট তো শেষ হয়েছে— কিন্তু বাকিরা? এঁরা যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন ভুগবেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হয়ে আসবেন মার্কিন দেশে প্রশিক্ষিত, অনাবাসী বা প্রবাসী ভারতীয় বিজ্ঞানীরা, যাঁদের কাজ হবে মার্কিন দেশের জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বেসরকারি প্রক্রিয়ায় এদেশের শিক্ষার্থী-গবেষকদের প্রশিক্ষিত করা। প্রথম প্রজন্মের এইসব প্রশিক্ষিত পেশাদারদের ভারতীয় জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি নির্ধারণকারী কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক— অনুদান গ্রহণের এটি একটি অন্যতম শর্ত। এই সমস্ত ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী সমিতিতে বিল গেট্স ফাউন্ডেশনের পরামর্শদাতারা থাকবেন, যাঁদের পরামর্শ মতো এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, গবেষণার বিষয় ঠিক করা হবে! বস্তুত কৃষিজ্ঞান উদ্যোগের সঙ্গে সম্পর্কিত শিক্ষা-প্রণালী সংক্রান্ত সুপারিশ ঠিক এই বিষযগুলি ঘিরেই।

ক্রিশ্চান মেডিক্যাল কলেজ, ভেলোর, আমাদের অনেকের কাজেই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্বর্গোদ্যান হিসেবে বিবেচিত হয়। গেট্স ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত দুটি তথাকথিত "স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা", ইনক্লেন এবং চাইল্ড হেল্থ ফাউন্ডেশন এই ভেলোর-এর ক্রিশ্চান মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে টীকাকরণ সংক্রান্ত দেশব্যাপী পাঠক্রম চালু করবে। এর জন্য তারা ভারত সরকারের কাছ থেকে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা পাবে। এই পাঠক্রমে কেবল মাত্র মার্কিন দেশের এবং অন্যান্য পিডিপি দ্বারা উদ্ভাবিত টীকাকরণ করার শিক্ষা দেওয়া হবে। কানাডা-র সংস্থা 'সেন্টার ফর রিসার্চ' আর্থিক অনুদান নিয়েছে গেট্স ফাউন্ডেশন থেকে। ভেলোর ক্রিশ্চান মেডিক্যাল কলেজ যখন তাদের এই পাঠক্রম প্রায় শেষ করে আনবে, তখন এই সেন্টার ফর রিসার্চ, এই পাঠক্রমে যে সমস্ত টীকা প্রদানের পদ্ধতি শেখানো হয়েছে, সেগুলিকে জনপ্রিয় করার জন্য বিরাট বিজ্ঞাপন যজ্ঞের আয়োজন করবে। যে টীকাগুলির জন্য এই মেগা বিজ্ঞাপন চলবে সেগুলি হলো ম্যালেরিয়ার টীকা এবং 'একসঙ্গে পাঁচটি রোগ প্রতিরোধ সক্ষম' একটি অপ্রমাণিত এবং প্রায়-অপরীক্ষিত একটি টীকা— যাকে 'পেন্টাভ্যালেন্ট' টীকা বলা হয়। এই বিজ্ঞাপন যজ্ঞের যাবতীয় খরচ ভারত সরকারের, অর্থাৎ সরকারি রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র বিজ্ঞাপন, পদযাত্রা, পোস্টার ইত্যাদির খরচ বহন করবে ভারত সরকার।

গেট্স সংস্থার আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত একটি বৃহৎ "স্বেচ্ছাসেবী" সংস্থার নাম "পাথ"। তারা ভারতীয় চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীদের টীকা সংক্রান্ত ফেজ-৩ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সংক্রান্ত পাঠক্রম প্রস্তুত করেছে— তাদের অন্যতম অংশীদার মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর। ভারত সরকার "পাথ"-এর সহযোগিতায় এই পাঠক্রম চালাবে। এই পাঠক্রম উত্তীর্ণ চিকিৎসকরা ভারত সরকারের চাকরিতে যোগ দেবে এবং সরকারি কোষাগার থেকে মাস-মাইনে নিয়ে বিদেশি সংস্থার জন্য গবেষণা চালাবে। এই গবেষণার ফল সরকার তুলে দেবে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের হাতে। মার্কিন সংস্থা গেট্স ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক অনুদানের এই শর্ত ভারত সরকার মেনে নিয়েছে।

> মোদি সরকারের বয়স মাস দুই হয়েছে। তারা গত ৪ঠা জুলাই ২০১৪ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বেসরকারি আর্থিক অনুদান সংস্থাগুলির সহায়তায় চালু সব কটি স্বাস্থ্য প্রকল্প যাতে সময় মতো শেষ হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে তারা, এবং পোলিও-মুক্ত ভারত গড়বে ২০১৫-র মধ্যে। পিডিপির-র মাধ্যমে উদ্ভাবিত রোটা ভাইরাস, রুবেলা এবং পোলিও টীকা ভারতের সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। পাশাপাশি ভারত সরকার তার সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পে পেন্টাভ্যালেন্ট টীকাকেও অন্তর্ভুক্ত করল। পেন্টাভ্যালেন্ট টীকার ছাড়পত্র দিয়েছে ভারত সরকারের টীকা নিয়ন্ত্রক সংস্থা, যার সদস্যদের সিংহভাগ এখন দখল করেছে দাতা সংস্থাগুলির পরামর্শদাতারা। সঙ্গে রয়েছে এথিক্স কমিটি— যার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ প্রমাণিত, রয়েছে টীকা প্রস্তুতকারী সংস্থার প্রাক্তন কর্মচারীবৃন্দ।

একটা সময়ে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা সস্তা শ্রমিকের অবিরাম জোগানের তাগিদে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে সরাসরি ক্রীতদাস আমদানি করত। পরবর্তীকালে শিল্পোৎপাদনের যুগে যখন তারা আমাদের মতো দেশগুলি থেকে শিল্প উৎপাদনের কাঁচামাল লুঠ করা শুরু করল, তখন তাদের প্রয়োজন হলো তাদের কারখানাগুলোর উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য অদক্ষ শ্রমশক্তির পরিবর্তে দক্ষ এবং কর্মঠ শ্রমশক্তির। তখন তারা আমাদের মতো দেশ থেকে দেশীয় তাঁবেদারদের বেছে নিয়ে এইসব তাঁবেদারদের মাধ্যমে দেশে দেশে 'শিক্ষা বিস্তার' নামক এক 'মানবিক কর্মকাণ্ড'-র ছদ্মবেশে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমশক্তির উৎপাদন নিশ্চিত করে।

বিশ্বায়ন পরবর্তী যুগে এখন তাদের প্রয়োজন তথ্য এবং জ্ঞান শ্রমিকের। এই দুটি ক্ষেত্রেই ভারত তাদের পছন্দসই দেশ। এখন তারা আবার সেই "স্বেচ্ছাসেবা"-র ধুয়া তুলে, দেশীয় তাঁবেদারদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান-শ্রমিক নির্মাণ করে নিচ্ছে— যে কর্মকাণ্ডের জন্য তারা কৃষি জ্ঞান-উদ্যোগ নামক নতুন নামটি বেছে নিয়েছে। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, খাদ্য থেকে পানীয় জল— সব ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে বিদেশি সংস্থার হাতে— দেশের মানুষ আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে এই বণিক-শ্রেষ্ঠীদের হাতে।

এর হাত থেকে মুক্তির পথ কী? অষ্টাদশ শতকে, উনবিংশ শতকে শ্রমিকরা প্যারিস, পেট্রোগ্রাদ, সাংহাই আর বোম্বের রাস্তায় এই বন্ধনের হাত থেকে মুক্তির পথ হিসেবে শ্রমের আন্তর্জাতিকতার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সাময়িকভাবে চক্রটির আবর্তন ঘটেছে বিপরীত মুখে। কিন্তু প্রতিরোধের পথ পাল্টায়নি। দেশে দেশে মানুষের আন্দোলনই মুক্তির একমাত্র উপায়।

প্রবন্ধ

বিশ্বশক্তির নতুন খেলা— রঙ্গমঞ্চ আরব দুনিয়া

দারা-শুকো

মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় যে রাজনৈতিক তোলপাড় চলছে এই প্রবন্ধে আমরা তার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করব। আমাদের অভিহিত অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা, ইংরাজিতে বলা হচ্ছে MENA (Middle East and North Africa)। বাংলায় আমরা এই *মেনা* নামটিই ব্যবহার করব।

শুরুর আগে বলে নেওয়া ভালো, প্রতিটি দেশে আন্দোলন, তোলপাড়, বিক্ষোভ-এর পেছনে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয় কাজ করছে। বর্তমান প্রবন্ধে কিন্তু আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব না। বরং ঐ অঞ্চলে বৃহৎ শক্তির খেলা কী ইঙ্গিত বহন করছে, সেটাই আমাদের প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

ঘটনাক্রম

ঘটনার শুরু ১৮ই ডিসেম্বর, ২০১০-এ, যখন উত্তর আফ্রিকার একটি দেশ তিউনিসিয়াতে জনৈক ভেন্ডার পুলিশি অত্যাচারে আত্মহত্যা করেন। ফলে সেখানে দেখা দেয় ভয়ঙ্কর পথ-প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদের ফলে মাত্র এক মাসের মধ্যে সেখানকার প্রেসিডেন্ট বেন আলী গদিচ্যুত হন ও সৌদি আরবে পালিয়ে যান। অবিচ্ছিন্ন প্রতিবাদের জোয়ারে আরও কতকগুলি ঘটনা দ্রুত ঘটে যায়। উল্লেখযোগ্য হলো, ২০১১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বেন গাজির পার্টি, অর্থাৎ প্রাক্তন শাসক পার্টিকে বরখাস্ত করা হয়, ৯ মার্চ সেটিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং ২৩ অক্টোবর সেখানকার নাগরিকরা বেন আলির ২৩ বছরের শাসনের শেষে একটি ২১৭ জন সদস্য-বিশিষ্ট সংবিধান সভা (constitution assembly) গঠনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে, যে সভা সেখানে নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব নেবে।

প্রতিবাদের ঢেউ এর পরে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ে আলজেরিয়া (২৯ ডিসেম্বর, ২০১০), জর্ডন (১৪ জানুয়ারি, ২০১১), ওমান (১৭ জানুয়ারি, ২০১১), মিশর (২৫ জানুয়ারি, ২০১১), ইয়েমেন (২৭ জানুয়ারি, ২০১১), জিবৌটি (২৮ জানুয়ারি, ২০১১), সোমালিয়া (২৮ জানুয়ারি, ২০১১), সুদান (৩০ জানুয়ারি, ২০১১), বাহরিন (১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১), লিবিয়া (১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১১), কুয়েত (১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১১), মরক্কো (২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১১), মউরিটানিয়া (২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১), লেবানন (২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১১), সৌদি আরব (১১ মার্চ, ২০১১), সিরিয়া (১৫ মার্চ, ২০১১), ইরান (১৫ এপ্রিল, ২০১১), ইসরায়েল (১৫ মে, ২০১১), এবং প্যালেস্তাইন-এ (৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২)।

বলা বাহুল্য, আন্দোলনের তীব্রতা সব দেশে সমান ভাবে অনুভূত হয়নি। এর মধ্যে আছে এমন চারটি দেশ যেখানকার শাসকদের জোর করে গদিচ্যুত করা হয়েছে— তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়া ও ইয়েমেন। তার মধ্যে লিবিয়াতে আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটো বাহিনী সরাসির ত্রিপলিতে কর্নেল গদ্দাফির সেনাবাহিনীর উপর আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করে বিদ্রোহী বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য ও এইভাবে গদ্দাফিকে তারা গদিচ্যুত করে এবং শেষে খুন করে। আমাদের আলোচনার সময়সীমা শেষ হচ্ছে ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে, যখন সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল ঠেকাতে প্রেসিডেন্ট গদ্দাফি কেমিক্যাল অস্ত্র ব্যবহার করেছেন, এই অজুহাতে আমেরিকা তার উপর মিসাইল আক্রমণের হুমকি দেয় ও প্রস্তুতি নেয়, যা কিনা রাশিয়ার হস্তক্ষেপের ফলে বানচাল হয়ে যায়।

গণ-অসন্তোষের ফলে গৃহযুদ্ধ?

পাশ্চাত্য মিডিয়ায় এই ঘটনা-পরম্পরাকে বলা হয়েছে জনগণের অসন্তোষের ফলে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধ। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি খুবই গ্রহণযোগ্য এক ব্যাখ্যা বলে মনে হয়, কেননা এ কথা সত্যি যে দেশে দেশে জনগণের দুঃখদুর্দশার শেষ নেই এবং তারা তো বিদ্রোহী হতেই পারে। এই প্রসঙ্গে, যদি গৃহযুদ্ধ বলতে সিভিল ওয়ার ধরে নিই, তবে এ ব্যাপারে লেনিন কী বলেছিলেন তা একবারে স্মরণে আনা যেতে পারে:

> আমরা সেই গৃহযুদ্ধকে সম্পূর্ণভাবে আইনি, অগ্রগতিমূলক ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করি যে যুদ্ধ অত্যাচারিত শ্রেণী চালায় অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে, সার্ফরা চালায় জমি-মালিকদের বিরুদ্ধে এবং মজুরি-শ্রমিকরা চালায় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। (*লেনিন*, *সোশ্যালিজম ও যুদ্ধ*, ১৯১৫)

আমাদের আলোচিত অঞ্চলে কী তাই ঘটছে? ''অত্যাচারিত শ্রেণী'' যুদ্ধ চালাচ্ছে ''অত্যাচারীদের'' বিরুদ্ধে? এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলির চালচলন, তাদের আন্তঃসম্পর্ক ও বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা এক কথায় এই তত্ত্ব মেনে নেবেন না।

প্রথমেই লক্ষ্য করুন যে ঘটনা শুরুর ক্রম। আলজেরিয়ার পর অকুস্থল লাফ মেরে চলে গেল প্রায় ২০০০ হাজার কিমির থেকেও বেশি দূরে, একেবারে সেই সুয়েজ উপসাগরের কোলে, জর্ডনে। তারপর পারস্য উপসাগরের ঢোকার মুখে সেই ওমানে, যা ওই অঞ্চলের তেল-বাণিজ্যের আরও একটি স্ট্রাটেজিক বিন্দু। আর তারপরই সুয়েজ উপসাগরের দুপাশে— মিশর থেকে সৌদি আরব অবধি দখল নেওয়ার জন্য যেন কোনও

বিশাল জন্তু পর পর তার থাবা বসিয়ে দিল। ভাবা দরকার, সে থাবা কি একই শক্তির, না ভিন্ন ভিন্ন শক্তির? আমাদের অনুমান, ভিন্ন ভিন্ন শক্তি হওয়াই সম্ভবপর।

একটা দখলদারির খেলা চলছে এবং আঞ্চলিক শক্তিকে অবিন্যস্ত করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, এটা অনুমান করা যেতে পারে। আমাদের কাজ, কারা সেটা করছে এবং কেন— তা অনুসন্ধান করা। এই কাজ আমরা শুরু করব বর্তমান পৃথিবীর বড় বড় শক্তিগুলির একটা তুলনামূলক আলোচনা দিয়ে।

বৃহৎ শক্তিগুলির বিন্যাস : পূর্বকথা

একটু মনে করা যাক ১৯৯৯ সালের কথা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে। পূর্ব ইউরোপে চলছে জাতি, ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে নানা বিভাজন, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সে সময় যুগোশ্লাভিয়ার উপর বিমান আক্রমণ শুরু করে মার্কিন নেতৃত্বাধীন যুদ্ধজোট ন্যাটো (নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন)। রাষ্ট্রসংঘ বা নিরাপত্তা পরিষদ এই অভিযান অনুমোদন করেননি। ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবেই আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি বহির্ভূত।

কেন এই হানা? ন্যাটোর বক্তব্য, এর জন্য আসলে দায়ী যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান শ্লোবোদান মিলোসেভিচ, কারণ তিনি যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ কসোভোতে বসবাসকারী আলবেনীয়দের উপর অত্যাচার করেছেন, তিনি মানবাধিকার লঙঘন করেছেন, ন্যাটো সূচিত কূটনৈতিক সমাধানের পথও বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে ন্যাটোর সামনে কোনো বিকল্প পথ ছিল না। উচিত শিক্ষা দিতেই করতে হয়েছে বিমান আক্রমণ।

সেই বিমান হানা শুধু সামরিক ঘাঁটিগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিভিন্ন বেসামরিক এলাকায় বোমা পড়েছে। হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী হয়েছেন। বোমা পড়েছে আলবেনীয় অধ্যুষিত অঞ্চলেও। যাদের উপর অত্যাচার মার্কিন বিমান হানার কারণ।

বোমা পড়েছে যুগোশ্লাভিয়ায় অবস্থিত চীনা দূতাবাসেও। কয়েকজন চীনা নাগরিক নিহতও হয়েছেন। বোমা বর্ষণে ভারত সহ আরো কয়েকটি দেশের দূতাবাসও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

চীনা দূতাবাসে বোমা পড়ার ঘটনায় তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ভুল স্বীকার করেছেন, দুঃখ প্রকাশও করেছেন। বলেছেন, লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণে ত্রুটি থাকায় এরকমটা ঘটে গেছে। তবে ক্লিন্টন এর জন্যও দায়ী করেছেন মিলোসেভিচকেই। কারণ তিনি অত্যাচার না করলে তো ন্যাটোকে বোমাবর্ষণ করতেই হতো না!

তবে দুর্জনে তখনই বলেছিল, এই ভুলটা ভুল করে হয়নি। চীন যেহেতু ন্যাটোর এই আক্রমণের নিন্দা করেছিল, নিরাপত্তা পরিষদেও নিন্দাসূচক প্রস্তাব এনেছিল, তাই হয়ত তাকে সবক শেখাতে...।

তাদের নিজেদের পশ্চাৎভূমি যুগোশ্লাভিয়ায় ন্যাটোর বিমান হানা রাশিয়াও মেনে নিতে পারেনি। তারাও বিরোধিতা করেছে। তবে তখন তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত, অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু। তবু নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার জন্য তারা একটা মিটমাটের চেষ্টা করেছে। রাশিয়ার প্রতিনিধি বারবার বেলগ্রেড গেছেন। দেখা গেছে, রাশিয়ার প্রতিনিধি যখনই বেলগ্রেড গেছেন, তখনই বিমান হানার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রাক্কালে বৃহৎ শক্তিগুলির, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের অবস্থা ও অবস্থান কেমন ছিল সেটা বোঝানোর জন্য আমরা যুগোশ্লাভিয়ায় ন্যাটোর বোমাবর্ষণের বিষয়টি আলোচনা করলাম। (এই অংশটির জন্য বর্তমান লেখক *সংগ্রামের দিশা*, জুন ১৯৯৯-তে প্রকাশিত শ্যামল নন্দী লিখিত 'যুগোস্লাভিয়ার সংকট ও মার্কিন-ন্যাটো আগ্রাসন' প্রবন্ধটির কাছে ঋণী।)

আমাদের মতে, এই টানাপোড়েন সময়ের সাথে সাথে আরো বাড়ছে। অতএব এখন আমরা দেখব, আমাদের সময়ে ওদের পারস্পরিক সম্পর্কটা কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে ধরা যাক চীনের কথা।

বৃহৎ শক্তিগুলির বিন্যাস : বর্তমান চীন

২৩ জুন, ২০১১-র *ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল* জানাচ্ছে—

> বুধবার চীনা বিদেশমন্ত্রী জে জিচি লিবিয়ার ট্রানসিশনাল কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান মহম্মদ জিব্রিল-এর সঙ্গে দেখা করেন এবং ঘোষণা করেন বিদ্রোহী দলটি এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ dialogue partner।
>
> চীন দৃঢ়ভাবে মহম্মদ গদ্দাফির শাসনের বিরুদ্ধে ন্যাটো পরিচালিত আক্রমণের সমালোচনা করেছে, কিন্তু এই মাসের গোড়ায় বিদ্রোহী দল ন্যাশনাল ট্রানসিশনাল কাউন্সিল-এর সাথে যোগাযোগ হওয়ার পর চীন এই প্রথম ওই দলের একজন সর্বোচ্চ নেতাকে আপ্যায়িত করল।
>
> ন্যাশনাল ট্রানসিশনাল কাউন্সিল-এর সাথে কথাবার্তার প্রাক্কালে চীন দক্ষিণ-চীন সাগরে ক্রমবর্ধমান তীব্র আঞ্চলিক বিবাদে আমেরিকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে ও চীনের কিছু প্রতিবেশীকে এই বলে অভিযুক্ত করে যে তারা ''আগুন নিয়ে খেলছে''।

সন্দেহ নেই, ১৯৯৯-তে যুগোস্লাভিয়ায় তার অবস্থানের তুলনায় ২০১১ সালে চীন উপস্থিত হয়েছে একেবারে বিপ্রতীপ মেরুতে, যেখানে তারা লিবিয়ার সম্ভাব্য শাসকগোষ্ঠীর একটিকে সাথে নিয়ে, ধীরে-সুস্থে আলোচনা চালাতে সক্ষম, এবং শুধু তাই নয়, প্রয়োজনমতো সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাবধানবাণী বা চেতাবনিও দিতে পারে। কী করে এটা সম্ভব হল?

প্রথমত চীনের জিডিপি ও আমেরিকার সঙ্গে তার

বাণিজ্যের তুলনামূলক অবস্থানটা দেখে নিতে হবে। আইএমএফ-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চীন এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জিডিপি-র দেশ, ও মার্কিনদের সবচেয়ে বড় মহাজন। এবার এর সঙ্গে নীচের খবরটি পড়া যাক।

ফিনান্সিয়াল টাইমস-এর সংবাদদাতা জিয়ফ ডায়ার বেজিঙ থেকে ১৭ জানুয়ারি, ২০১১ কী জানাচ্ছেন দেখুন—

> গত দু'বছরে চীন বিশ্বব্যাংকের চেয়েও বেশি অর্থ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ধার দিয়েছে, যা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় বেজিঙ-এর অর্থনৈতিক হাত কতদূর বিস্তৃত এবং প্রাকৃতিক উৎসগুলি কব্জা করতে সে কতদূর আগ্রহী।
>
> ২০১১ সালে *ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের* নিজস্ব গবেষণায় প্রকাশ, চায়না ডেভলপমেন্ট ব্যাংক ও চায়না এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক ২০০৯ ও ২০১০ সালে এক বছরে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ১১০ বিলিয়ন ডলার ধার দিয়েছে। মধ্য-২০০৮ থেকে মধ্য-২০০৯-এর মধ্যে বিশ্বব্যাংকের তুলনামূলক সংখ্যাটি হল ১০০ বিলিয়ন ডলার; চীনের এসব চুক্তির মধ্যে পড়ে বৃহৎ তেল-ঋণ, যা স্বাক্ষরিত হয়েছিল রাশিয়া, ভেনেজুয়েলা ও ব্রাজিলের সঙ্গে আর শক্তি উৎপাদন ও পরিকাঠামোর খাতে ঋণ-এর চুক্তি হয়েছে একটি ভারতীয় কোম্পানির সঙ্গে— ঘানা ও আর্জেন্টিনায় রেলওয়ে গড়ে তোলার জন্য।
>
> বিশ্ব-ব্যাংক সমানে চেষ্টা করে যাচ্ছে বেজিঙ-এর সাথে সহযোগিতার রাস্তা খুঁজে বার করতে এবং এই ঋণ দেওয়া নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতার অবসান করতে। অতীতে চীন নিজেই বিশ্বব্যাংকের ঋণের এক অন্যতম বড় গ্রাহক ছিল। বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট রবার্ট জলিক গত বছর চীন সফরে গিয়ে বলেছিলেন, "চীনের সঙ্গে আলোচনার একটি প্রধান বিষয় হল কীভাবে আমরা ঋণদানের ব্যাপারে আমাদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারি, সে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া বা আফ্রিকা, যেখানেই হোক না কেন"।
>
> তেল উৎপাদনকারী দেশগুলিকে দেওয়া চীনা ঋণের পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় আমেরিকা তার তেল নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। ব্রুকলিন ইন্সটিট্যুটের এক চীনা বিশেষজ্ঞ, এরিকা ডাউন্স-এর মতে আমেরিকার স্বার্থের প্রতি চীনা অভিঘাত হল মিশ্র প্রকৃতির। চায়না ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের শক্তি-ঋণ ইঙ্গিত করছে যে চীনা নেতারা গ্রাহক দেশে উত্তম নীতি প্রণয়ণে আগ্রহী হবেন এবং তারা মার্কিন বরাদ্দও কমিয়ে দিচ্ছেন না। তিনি বলেন, অপরদিকে, '*চীনের এই ঋণ ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলিতে মার্কিন-বিরোধী শাসকগোষ্ঠীকে শক্তিশালী করবে*"। (জোর লেখকের)
>
> চায়না ডেভলপমেন্ট ব্যাংক ও এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক-এর বিদেশি ঋণকে বেজিঙ, চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি ও চীন-রাষ্ট্রের স্বার্থ পূরণের জন্য ব্যবহার করছে এবং তার মুদ্রাকে আরও আন্তর্জাতিক করার জন্য সচেষ্ট রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ভেনেজুয়েলাকে দেওয়া ২০ বিলিয়ন ডলারের অর্ধেকটা স্থিরীকৃত হয়েছে রেনমিনবি-তে (চীনের মুদ্রা) এবং ঠিক হয়েছে তা দিয়ে ভেনেজুয়েলা চীন থেকে মালপত্র কিনবে। অন্য ক্ষেত্রগুলিতে ঋণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থমুদ্রা সরাসরি চীনের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার থেকে এসেছে।" (*Financial Times,* ১৭.১.২০১১)

এর অর্থ, এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডলারের জন্য চীনকে যেহেতু আন্তর্জাতিক ডলার বাজারে উপস্থিত হতে হয়নি, অতএব তার ফলে ডলারের মূল্যে কোন প্রভাব পড়েনি। বলাবাহুল্য, যে কেউ আন্তর্জাতিক বাজারে ডলার কিনতে চাইলে ডলারের মূল্য বাড়ে ও বেচতে চাইলে কমে। চীনের এই প্রয়োজন না হওয়ার কারণ, তার কাছে দুই ট্রিলিয়নের (দু লক্ষ কোটির) বেশি ডলার মজুত আছে, যা সে গত এক দশকে আমেরিকার সঙ্গে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যে জমা করেছে।

এইসব তথ্য দেখিয়ে দেয় যে চীন বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও শক্তির প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম। আর করছেও তাই। তার অন্যতম একটি প্রকাশ হল অস্ত্রশক্তির প্রদর্শনী। উপনিবেশের যুগ (Colonial era) থেকে লগ্নি-পুঁজির যুগ (Financial Capital era) পর্যন্ত চলে আসা 'গান-বোট ডিপ্লোমেসি'র প্রকাশ যে এক্ষেত্রে সবার আগে দেখতে পাওয়া যাবে, তা আন্দাজ করা যায়। ২০০৯ সালে প্রকাশিত নীচের সংবাদটি এ ব্যাপারে আলোকপাত করবে—

> ষাট বছর আগে নটি বড়ো ও সতেরটি ছোট যুদ্ধজাহাজ নিয়ে বিদ্রোহী নৌসেনারা চিয়ান-কাই-শেকের পক্ষ ত্যাগ করে চীনের কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের সাথে হাত মেলায়। বিদ্রোহীদের সেই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত জলযানের বহর থেকে আজকের চীনের আধুনিক যুদ্ধ-নৌ-বহর গড়ে উঠেছে। ওই ঘটনার বর্ষপূর্তিতে, কুইঙডাও-এর পোতাশ্রয়-শহরে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সমুদ্রযান প্রদর্শনীতে চীন দেখিয়ে দিল যে, সে সেদিন থেকে কতদূর চলে এসেছে।
>
> ২৩শে এপ্রিল, অন্য ১৪টি দেশের ১৭টি যুদ্ধ জাহাজ কুইঙডাও থেকে যাত্রা শুরু করে, যার মধ্যে আমেরিকার দম্ভ সপ্তম নৌবহরের একটি মিসাইল ডেস্ট্রয়ারও ছিল। এই দিনই সর্বপ্রথম, চীনের আণবিক ডুবোজাহাজ, যাদের ওপর এতদিন কেবল গুপ্তচর উপগ্রহ থেকেই নজরদারি করা যেত, সর্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করল। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমে চীন জোর দিয়ে বলে যে তার নৌ-শক্তির এই বল-প্রদর্শন "শুধুমাত্র চীনের সামরিক বাহিনীর উন্নতি বোঝাবার জন্য"। কিন্তু কেউ কেউ একে একটি ক্রমবর্ধমান শক্তি

প্রদর্শনকারী এক দেশের ''একটি অশুভ প্রচেষ্টা'' বলে মনে করছেন। চীনের নৌবহর আজ দেশ ছেড়ে বহুদূরে পাড়ি দিচ্ছে, এডেন উপসাগরে সোমালিয়ার জলদস্যুদের পাহারা দিচ্ছে। দেশটির হাতে ৮টি নতুন নিঃশব্দচারণ (স্টিল্থ) ডুবোজাহাজ আছে, এবং বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন তারা শীঘ্রই বিমানবহর বহনকারী নৌবহর গড়ে তুলবে, যা, বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, দিনে দিনে মার্কিন নৌবহরকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করতে পারবে। গত ৮ই মার্চ চীনের তট থেকে ৭৫ মাইল দূরে একটি মার্কিন নজরদারি জাহাজকে চীনারা যেভাবে বিব্রত করে, সেরকম ঘটনা থেকে এই ধরনের আশঙ্কা জোরদার হচ্ছে।

এপ্রিলের প্রথমদিকে মার্কিন নৌ কার্যকলাপের প্রধান, অ্যাডমিরাল গ্যারি রগহেড চীনে তার সম-পদমর্যাদা সম্পন্ন ভাইস অ্যাডমিরাল উ সাং লির সঙ্গে দেখা করেন। তারা জলদস্যু দমনের ব্যাপারে কথা বলেন, কিন্তু, রগহেড উ সাং লিকে চীনের নৌবহর ও নৌবরাদ্দ সম্বন্ধে বলতে উৎসাহিত করেন— যে ব্যাপারটি আমেরিকার কাছে ক্রমাগত জরুরি হয়ে উঠছে, কারণ *অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মার্কিন সরকার এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ারের মত উচ্চমূল্যের মিলিটারি হার্ডওয়্যার-এর জন্য ব্যয়বরাদ্দ ক্রমশ কমিয়ে আনছেন।* কুইঙডাওয়েয় প্রদর্শনী চীনের সারল্য ও সামর্থ্য, দুইয়েরই প্রকাশ''। (*টাইম*, এশিয়া, ৪.৫.২০০৯)

উপরের অংশটিতে এডেন উপসাগরে চীনের পাহারাদারির যে উল্লেখ আছে তা আমরা আরও একটু বিস্তৃতভাবে দেখব কিন্তু মনে রাখতে হবে চীনা নৌবহর শুধু এডেন উপসাগরে বিরাট ভূমিকা পালন করছে তা নয়, প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ইতিহাসে এই প্রথমবার, লিবিয়ার সঙ্কটের সময় তার যুদ্ধজাহাজ ভূমধ্যসাগরেও উপস্থিত হয়েছিল। এবার নীচের রিপোর্টটি দেখা যাক।

এখন অবধি মধ্যপ্রাচ্যে চীনের নৌ-উপস্থিতি জলদস্যু নিবারণেই সীমাবদ্ধ আছে। গত চার বছরে পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভি (PLAN) দু-ডজনেরও বেশি হেলিকপ্টার সহ দু-ডজনেরও বেশি যুদ্ধ জাহাজে ১০ হাজারেরও বেশি সৈন্য ওখানে নিয়োগ করেছে। পাঁচশ'র বেশি বাণিজ্য-জাহাজকে রক্ষা করেছে— যার মধ্যে সম সংখ্যক চীনা ও বিদেশী জাহাজ ছিল। ৫০টিরও বেশি দেশ ঐ সকল বিদেশী জাহাজের মালিক।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলির সঙ্গে চীনের মোট বাণিজ্য মূল্য ২০১০-এ ছিল প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার। এই ক্রমবর্ধমান চীন-ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাণিজ্য কাব-আল-মানদেব বন্দর, এডেন উপসাগর ও ভারত মহাসাগরে চীনের জাহাজগুলির নিরাপত্তা দাবি করে। তার উপর চীন এখন তার তেল আমদানির ২০ শতাংশ করে সৌদি আরব থেকে।

ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক ও যুদ্ধ বাজেট সংকট এবং তার সাথে আমেরিকা ও কানাডায় অপ্রচলিত তেল উৎপাদনের ফলে পারস্য উপসাগরীয় তেলের উপর মার্কিন নির্ভরতা হ্রাস, ইঙ্গিত করে যে মধ্যপ্রাচ্যে তেল সুরক্ষার জন্য মার্কিন মিলিটারি তৎপরতা কমবে।

PLAN-এর রক্ষী জাহাজগুলি ইতিমধ্যে চারটি মহাদেশের ৩০টি দেশের বন্দরে তেল ভরতে ও মেরামতি করতে হাজির হয়েছে। যার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব বন্দরই পড়ে, তবে ওরই মাঝে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো সলাহ বন্দর, ওমান, জিবৌটি, পাকিস্তান ও সৌদি আরব''।

US-China Economic and Security Review Commision-এর রিপোর্ট, ২০১৩ (www.andrewericson.com)

চীনের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির এই ধরনের অর্থনৈতিক আঁতাত খেয়াল রাখলে অনুমান করা যায় মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার পালা বদলে সে এবার আর শুধু নীরব দর্শক হয়ে থাকবে না, মার ও পাল্টা-মারের খেলায় অংশ নেবে।

রাশিয়ার কথা

রাশিয়ার কথা শুরু করব এইটা মনে রেখে যে সিরিয়ার ঘটনায় (১৯১৩-১৪) দেখা গেল সিকিউরিটি কাউন্সিলে রাশিয়া ও চীনের যৌথ আপত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত সিরিয়ার উপর একতরফা মিসাইল আক্রমণ করতে সাহস পেল না। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার এই জবরদস্ত 'বন্ধুটির' অনুরোধ এমনি এমনি রাখে নি। ইত্যবসরে রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে তার রণতরী পাঠিয়ে দিয়েছিল, এবং সে সংখ্যা দুই থেকে ক্রমশ দশে বৃদ্ধি পায়। একটু ভেবে দেখলে উপলব্ধি করা যাবে যে এই ঘটনা আমেরিকার কাছে শাঁখের করাতের মত। সে যদি এই চেতাবনি অগ্রাহ্য করত, বলা যায় না, হয়ত ভূমধ্যসাগরে তার জাহাজের সলিলসমাধি ঘটত বা আরও বড় আকারের যুদ্ধে সে জড়িয়ে পড়ত। তার পতনোন্মুখ অর্থনীতি সেই ধাক্কায় আরও ডুবে যেত। আর এখন আক্রমণ স্থগিত রাখার ফলে অন্যদিকে সারা বিশ্বে এই বার্তা চলে গেল যে সে আর এক ও অদ্বিতীয় শক্তি নয়।

এখন আমরা দেখে নেব এই ঘটনার পশ্চাদভূমিটিকে।

ভ্লাদিমির পুতিন, যিনি গত ১৩ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন, ইউএসএ-র সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের একটা ইতিহাস আছে। সেই ইউএসএ, যারা একদা বিশ্বজোড়া পাতা দাবার ছকটিতে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল। কসোভো লড়াইয়ের সময় যে সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়, ন্যাটোর সঙ্গে সেই সম্পর্ক জোড়া দিয়ে তিনি পথ চলা শুরু করেন। এবং এক সময় ন্যাটোর

সদস্য পদের জন্যও আবেদন জানিয়েছিলেন— যে ন্যাটো কিনা ঠান্ডা যুদ্ধের সময় লাল ফৌজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকত। সেপ্টেম্বর ১১-র ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তিনি জর্জ বুশকে শুধু ফোনই করেননি, বরং ইউএসএ-র আফগান অভিযানে সক্রিয় ও যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য দিয়েছিলেন— এবং প্রাক্তন সোভিয়েত মধ্য এশিয়াতে বড় আকারের মার্কিন সামরিক উপস্থিতি সহ্য করেছেন। যে এবিএম চুক্তিকে (Anti Ballistic Missile Treaty বা মিসাইল বিরোধী চুক্তি) মস্কো নীতিগতভাবে নিরাপত্তার পক্ষে সবসময়ই অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে, আমেরিকা সেই চুক্তিতে সই করতে না চাইলেও পুতিন বাড়াবাড়ি রকমের প্রতিক্রিয়া দেখান নি। তিনি বুশের ইরাক অভিযান ও ন্যাটোর বাড়বাড়ন্তকেও সয়ে নিয়েছিলেন— যে বাড়াবাড়ির মধ্যে পড়ে তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্রের (লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া) দিকে ন্যাটোর নজর। সুতরাং একথা বলা যায় যে আমেরিকার সঙ্গে নতুন রাশিয়ার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল সমঝোতার সম্পর্ক।

পুতিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি প্রধানত সদর্থক সম্পর্ক পালটিয়ে গেল ইউক্রেন, কিরঘিজিস্থান ও জর্জিয়াতে 'রঙিন বিপ্লবের' পর, যে অঞ্চলকে রাশিয়া তার 'স্বার্থের পরিমণ্ডলের' মধ্যে বলে মনে করে, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত দেখতে পাওয়ার পর। পুতিন এই রঙিন বিপ্লবকে গণ্য করল খোদ রাশিয়াতে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার পূর্ব অবস্থা হিসেবে। পুতিন তারপর থেকেই পথ পরিবর্তন করেন এবং পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আবর্ত থেকে বেরিয়ে আবারও রাশিয়াকে একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেন। এটি সম্ভব হয় গত এক দশক ধরে তেলের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে। মিউনিখে একটি বক্তৃতায় (১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৭) তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধে হঠাৎ-ই ফেটে পড়েন, কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হয় না কারণ জর্জিয়া ও ইউক্রেন-এর ন্যাটো-অন্তর্ভুক্তিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মদত দিতে থাকায় পূর্ব-ইউরোপের ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে থাকে। গোটা ব্যাপারটায় সমাপ্তি হয় রাশিয়া ও জর্জিয়ার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধের পরে, কারণ জর্জিয়াকে রাশিয়া তার ঘরোয়া ব্যাপার হিসেবেই দ্যাখে। যদি সেই সংকট ইউক্রেন, বা অন্তত ক্রিমিয়া অবধি পৌঁছত, আমেরিকা-রাশিয়ার মধ্যে একটি সরাসরি সংঘাত এড়ানো অসম্ভব হত''। ('Russia's Middle-East End Game, at the hands of the post-Soviet Grandmaster', Dimtri Trenin, August 1, 2013, tablet/@dmitritrenim)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বার্মার ব্যাপারে চীনেরও ওই একই মনোভাব। বার্মাকে তারা মনে করে যমজ ভাই। অতি সম্প্রতি তারা ভারত মহাসাগরে পৌঁছনোর জন্য একই সঙ্গে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও বার্মার কোকো দ্বীপপুঞ্জ ব্যবহার করছে, চীন থেকে সেখান অবধি রেলপথও পেতেছে। চীনের বক্তব্য, বার্মার সঙ্গে কোন মতান্তর হতেই পারে, তবে সেটা হলো দুই ভাইয়ের মধ্যেকার ব্যাপার, সেখানে বাইরের কেউ যেন নাক গলাতে না আসে। বোঝাই যাচ্ছে, বার্মার প্রাক্তন মালিক বা বর্তমান বড়দাদা, কেউ যদি নাক গলাতে আসে তবে সেখানেও আর একটা জর্জিয়া হয়ে যাবে। বার্মার অভ্যন্তরে যে সকল তীব্র উত্থান চোখে পড়ছে সেগুলিকে এই সব মহাশক্তির খেলা থেকে আলাদা করে দেখলে হবে না।

এরপর পুতিন কিছুদিন ক্ষমতায় ছিলেন না, ছিলেন মেদভেডেভ। এদিকে আমেরিকাতে প্রেসিডেন্ট হয়ে এসেছেন বারাক ওবামা। সেই অবসরে আবার কী ঘটল সেটা শুনুন ওই লেখক দিমিত্রি ট্রেনিনের কাছ থেকে—

> ওবামা সোভিয়েত-উত্তর মহাকাশ কর্মসূচিতে কোন আগ্রহ দেখালেন না, (পড়তে হবে, এই নিয়ে কোন চাপ সৃষ্টি করলেন না) যা (রাশিয়ার পক্ষে) ভাল, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসাইল প্রতিরক্ষা প্ল্যান বাজেট কমিয়ে দিলেন, সেও ভাল; কিন্তু লিবিয়াতে রাষ্ট্রশক্তি পরিবর্তনে বোমা ব্যবহার করলেন, তা খুব খারাপ, খুবই খারাপ।
>
> যখন পুতিন ক্রেমলিনে ফিরে এলেন তখন তিনি রেগে কাঁই, কেননা তিনি ভাবতে শুরু করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ শুরু করেছে। তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে এই বলে অভিযুক্ত করলেন যে তারা রাশিয়াতে যে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়েছে তার জন্য টাকা দিচ্ছে ও তা পরিচালনা করছে। (দিমিত্রি ট্রেনিন, পূর্বোক্ত)

যদি রাশিয়ার মত শক্তিধর দেশেরই এই অবস্থা হয় তবে দুর্বল দেশগুলিতে যা হতে পারে তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি। বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমেরিকার (ও অন্যান্য ঘাঘু সাম্রাজ্যবাদীদেরও বটে) একটা শক্তপোক্ত নীতি আছে। যে কোন জাতি-রাষ্ট্রকে দুর্বল করার জন্য তার অভ্যন্তরে যে কোন জাতি, জাতিসত্তা, উপজাতি, ধর্মীয় গোষ্ঠী ও অন্য কোন সংখ্যালঘুদের ও বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিকে মদত দিয়ে আলাদা রাষ্ট্র, আলাদা অঞ্চল, আলাদা রাজনৈতিক শাসন-পরিষদ ইত্যাদি দাবি তুলে রাষ্ট্রটিকে দুর্বল করে দিতে, এবং ভেঙ্গে দিতে সচেষ্ট থাকে তারা।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

এবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিয়ে দুচার কথা বলা যাক।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্বন্ধে একথা বলতে হবে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার লেন্ড-লীজ

সাহায্য ও মার্শাল প্ল্যানের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে একটি উপনিবেশে পরিণত করেছিল, বছর ২০-র মধ্যে সেই ইউরোপ ঘুরে দাঁড়াতে আরম্ভ করে ও ফ্রান্সের স্বর্ণ-যুদ্ধর ঠ্যালায় আমেরিকা তার স্বর্ণমান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তখন থেকেই ওই দুই অঞ্চলের মধ্যে শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করে। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর জিডিপি আমেরিকার থেকে বেশি।

ওদের সম্পর্কের পূর্বাভাস পাওয়া যাবে আমেরিকার প্রাক্তন পররাষ্ট্র-সচিব বিগনিউ ব্রেজেনস্কি-র The Grand Chessboard : American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (1997) বইটি থেকে। বইটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম হলো 'ইউরোপীয় দাবার ছক'। এখানে তিনি লিখছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রধান ভূ-রাজনৈতিক পুরস্কার হলো ইউরেশিয়া (অর্থাৎ ইউরোপ ও এশিয়া একত্রে)। এ কথার অর্থ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গোটা ইউরোপ ও এশিয়া ভূখণ্ডটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের স্বার্থরক্ষার এলাকা। স্বভাবতই, বুঝতে অসুবিধা হয় না, নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য এই অঞ্চলে তারা যা কিছু করা ন্যায্য মনে করবে তাই করবে। তাতে অন্যদের কপালে যাই জুটুক না কেন। এই করতে গিয়ে, ব্রেজেনস্কি লিখছেন, ''আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যদের দাবিয়ে রাখার জন্য সেখানকার দেশীয় প্রতিরোধকে সরাসরি সাহায্য দান; ও পারস্য উপসাগর অঞ্চলে এক বিরাট সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলা যাতে কিনা রাশিয়া কোনমতেই দক্ষিণ দিকে রাজনৈতিক বা সামরিক অগ্রগতি ঘটাতে না পারে''। ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপের সঙ্গে স্বার্থ ভাগাভাগি করতে পারবে?'' প্রশ্নের উত্তরে ব্রেজেনস্কি নিজেই জানাচ্ছেন যে ইরাক-ইরান নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের সঙ্গে সমানে সমানে ব্যবহার করেনি, বরং ইউরোপ তার কথা শুনে চলেনি বলে মনে করছে। মনে করছে যে ইউরোপ বেয়াড়াপনা করছে।

সুতরাং যদিও বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন মধ্যে সহযোগিতাই বেশি করে চোখে পড়ে, কিন্তু ওদের মধ্যে দ্বন্দ্বও বর্তমান। এই দ্বন্দ্বের বড় প্রমাণ হলো, সাদ্দাম হোসেনের ডলারের বদলে ইউরোকে চালু করার চেষ্টা বানচাল করাই মার্কিনদের দ্বিতীয়বার ইরাক আক্রমণের এক বড় কারণ। ইরাক আক্রমণের (২০০৭) সময় প্রধানত ফ্রান্স এবং আর দু-একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র তাতে বাধা দিয়েছিল।

> ২০শে মার্চ, ২০০৩-এ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইরাকে যুদ্ধ শুরু হয়, ফ্রান্সের সরকার সেটিকে সমর্থন করেনি। যদিও এই বাধাদানের ব্যাপারে ফ্রান্স একা ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে, তার প্রচেষ্টা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। জার্মানিও বাধা দিয়েছিল, কিন্তু সেই সময়ে সে ছিল নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য। যাই হোক, ফ্রান্স বাধা দিয়েছিল সর্বশক্তি দিয়ে, আর সে জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসে তাকে তুলোধোনা করা হয়েছে সব চেয়ে বেশি। ২০০৩-এর ৪ ফেব্রুয়ারি নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি লেখায় ফরাসি মদ বয়কটের আহ্বান এর প্রধান লক্ষণ।''

'The impact of the Iraq war on French wine sales in the U.S', Larry Chavis, Philips Leslie (chavis@unc.edu)

সেই সময় রাশিয়া এই বাধাদানের শরিক ছিল না। আর সেপ্টেম্বর ২০১৩-এর দ্বিতীয় সপ্তাহে সেই নিউ ইয়র্ক টাইমসেই বের হয় রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নিবন্ধ, যেখানে তিনি সিরিয়াতে কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, তা যুক্তিসহ বুঝিয়েছেন। দিন কতখানি পাল্টেছে, এর থেকে বোঝা যায়।

অর্থাৎ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন বাণিজ্য সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, তেমনই ওদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতও আছে। সেই সংঘাত সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় যুদ্ধাস্ত্র বেচাকেনার সময়। যদি কোন দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বদলে ফ্রান্সের অস্ত্র কেনে তাহলেই মার্কিনদের মুখ ভারি হয়।

আর একটা ব্যাপারে ওই দুই দেশগুচ্ছের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ পেয়েছে। সম্প্রতি ইউরোপে যে পার্টিকেল অ্যাক্সিলেটর বসানো হয়েছে, সেটি আদতে হওয়ার কথা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, পয়সার জন্য তারা সেটি বসাতে পারেনি। আর যদি এই সরল প্রতিপাদ্যে বিশ্বাস না করি যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেই দুর্মূল্য পরীক্ষা চালাচ্ছে কেবল বিমূর্ত বিজ্ঞানের রহস্য উন্মোচনের জন্য, তাহলে এই আশঙ্কা মাথায় রাখতে পারি যে, এর থেকে কোন অসম্ভব শক্তিশালী অস্ত্র আবিষ্কারের তাত্ত্বিক সম্ভাবনা আছে। তাই যদি হয়, তবে এর মালিক হবে কে? ইউরোপীয় ইউনিয়ন? নাকি, একলা ফ্রান্স? ভুলে গেলে চলবে না, এই পরীক্ষাগারের অনেকটাই ফ্রান্সের মাটির তলায়। আর কে না জানে ফ্রান্স-জার্মান-ব্রিটেন-এর মধ্যে শত্রুতার ও রেষারেষির ইতিহাস কত দীর্ঘ!

_মেনা_ অঞ্চলে ওলটপালট ও বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা

শক্তিবর্গের ভারসাম্যের বর্ণনা শেষ হল। এই ছবি সামনে রেখে আমরা দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজব। এক, এই সময়েই *মেনা* অঞ্চলে এই ভাঙ্গনের খেলা কেন? এবং দুই, এই খেলার ভবিষ্যৎ কী?

সারা পৃথিবী সম্বন্ধে মার্কিন কর্তাদের মনোভাব ভাল প্রকাশ পেয়েছে ১৯৯৭ সালে প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব বিগনিউ ব্রেজজিনস্কির লেখা পূর্বোল্লিখিত বইটি থেকে। যে বইতে তিনি ঘোষণা করেছেন যে গোটা ইউরেশিয়া-ই হলো আমেরিকার

স্বার্থের অঞ্চল এবং সেখানে স্বার্থ বজায় রাখতে কী কী করা দরকার সেটাই তিনি সেখানে বলার চেষ্টা করেছেন। নীচের অংশটি তাদের কার্যক্রমের আভাস :

> সবথেকে বড় কাজ হল, এটা দেখা যে কোনও রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-জোট যেন এত শক্তিশালী না হয় যে তা আমেরিকাকে ইউরেশিয়া থেকে বার করে দিতে পারে বা তার মধ্যস্থতাকারির চূড়ান্ত ক্ষমতা দারুনভাবে হ্রাস করতে পারে''। (The Grand Chessboard, Zbigniew Brzezinski, p.197)

খেয়াল রাখতে হবে, মধ্যপ্রাচ্যে তথা ইউরেশিয়া সম্বন্ধে আমেরিকার মনোভাবে একটা দ্বিধাবিভক্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তার মধ্যে ব্রেজজিনস্কির যে মনোভাব, সেটি একটু পুরনো, অর্থাৎ ইউরেশিয়াতে আধিপত্য বজায় রাখতে হবে। রাখতে হবে সে তো ঠিকই, কিন্তু ১৯৯৭-তে ওই নীতি নেওয়ার পর নিদারুণ অর্থনৈতিক মন্দার পর আমরা দেখছি, সরাসরি ঘাঁটি বজায় রাখাও সম্ভব হচ্ছে না।

এই অবস্থায় ইসরায়েলের গুরুত্ব অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, ইসরায়েল হল ব্রিটিশদের মানস সন্তান, সদ্য-জাগ্রত আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত প্রহরী এবং পরবর্তীকালে এতদ্‌ঞ্চলে আমেরিকার মিত্র ও দক্ষিণ হস্ত। কাজেই এই সময় যে কোন রাজনৈতিক বিশ্লেষণে ইসরায়েলের ভূমিকাটা আলাদা করে যাচাই করে নিতে হবে। আপাতত এটুকু বলা যায়, *মেনা* অঞ্চলের ঘটনাবলিতে আমেরিকা-ইসরায়েলের যৌথ ভূমিকা আছেই। তবে, একথাও বলতে হবে ইসরায়েলের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কটাও আর অবিমিশ্র ভালোবাসার সম্পর্ক থাকছে না, কেননা অতি সম্প্রতি চীন ইসরায়েলের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে সুয়েজ খালের সমান্তরাল একটি রেলপথ পাতবার জন্য। সুয়েজ খাল পৃথিবীর বাণিজ্য তথা রাজনৈতিক মানচিত্রে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। এখন এই নতুন রেলপথ কী নিয়ে আসে দেখা যাক।

এখন প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ, এই সময়েই *মেনা* অঞ্চলে এই ভাঙ্গনের খেলা কেন, তার জবাব দিতে গিয়ে যুদ্ধের কারণ হিসাবে স্তালিনের একটি ধ্রুপদী বিশ্লেষণ আমরা উপস্থিত করব :

> এটা ভাবা ভুল হবে যে যুদ্ধটা একটা দুর্ঘটনার বা কিছু কূটনীতিবিদের ভুলের ফসল। যদিও এই ভুলগুলো ছিল, যুদ্ধ এসেছে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতির বিকাশের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে। আমরা মার্কসবাদীরা ঘোষণা করি যে, বিশ্ব অর্থনীতির ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার অভ্যন্তরে সংকট ও যুদ্ধের বীজ লুকিয়ে রাখে। বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটি স্থির ও সুষম সম্মুখগতিতে এগোয় না, বরং সংকট ও ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে এগোয়। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির *অসম বিকাশ* (জোর লেখকের) সময়ের ফলে সাথে সাথে তাদের সম্পর্কের মধ্যে তীব্র ঝামেলা বাধিয়ে দেয়; যে সমস্ত দেশ মনে করে যে তাদের ভাগে কাঁচামালের উৎস বা রপ্তানির বাজার কম পড়ে গেছে, তারা সাধারণত সামরিক শক্তি ব্যবহার করে পরিস্থিতি নিজের দিকে আনার চেষ্টা করে।... এইভাবে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের প্রথম সংকট জন্ম দিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। দ্বিতীয় সংকটের ফলে এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

স্তালিনের এই বিশ্লেষণ আমরা মনে করি মূলগত ভাবে সঠিক। শুধু পরবর্তী কালে কিছু গৌণ পরিবর্তন হয়েছে। যেমন,

১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই আমেরিকান অর্থনীতি পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয়েছে যাকে পরিভাষায় বলা হয় মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স-এ। সুতরাং এই কালে সাধারণ পণ্যের পাশে জায়গা নিয়েছে অস্ত্র। যদিও কাঁচামালের উৎসের জন্য লড়াইটা আরও তীব্রতর হয়েছে।

২) এখন দেখা যাচ্ছে, যাদের সাম্রাজ্য পৃথিবী জোড়া, সেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই যেন যুদ্ধ বাধাবার জন্য বেশি তৎপর, বেশি আগ্রাসী, আর নতুন শক্তিরা আপাতত যুদ্ধের পথে যাচ্ছে না, তারা বিশ্ব-বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা বাড়াতে আগ্রহী।

কিন্তু তার জন্য মূল যুক্তি বদলায় না। ২০০৭-২০০৮ সালে আমরা দেখলাম আমেরিকার অর্থনৈতিক সঙ্কট আর ২০১০-এ শুরু হল *মেনা* অঞ্চলের পরিবর্তন ও সংঘর্ষ। যেহেতু এবারের সঙ্কটকে বলা হচ্ছে ১৯২৯-এর মহাসঙ্কটের তুলনায় আরও বেশি তীব্রতর, সুতরাং এবারের ফলাফল যে হবে আরও সুদূরপ্রসারী, তা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না। ১৯২৯-এর মহাসঙ্কটের ফল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ, ও সেই অবসরে চীনের মত একটি পশ্চাৎপদ দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। তাই যদি হয়, তবে এবারের সঙ্কটের ফলে আমেরিকা ও ইউরোপের মত অগ্রণী দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে, এ আশা কি খুব অমূলক?

এখন যুদ্ধের গতিবিধি বোঝার জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ধরা যাক, লিবিয়ার কথা। কর্নেল মহম্মদ গদ্দাফির সম্পর্কে কটি কথা বলা যায়, যার জন্য তিনি সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের ভীষণ শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ইতালির সাথে চুক্তি করে তাদের বাধ্য করেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন যে ক্ষয়ক্ষতি তারা করেছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে। সত্যি বলতে কি এই একটি অপরাধের জন্যই তাকে বিশবার উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু গদ্দাফির অপরাধ শুধু এই একটাই নয়। লিবিয়ার মাটির তলায় রয়েছে এক বিশাল জলের ভান্ডার, ইংরাজিতে যাকে বলে অ্যাকুইফার। সে জলের পরিমাণ আগামী ৫০০ বছর নীল

নদ দিয়ে যত জল বইবে, তার সমান। ১৯৯১ সালেই গদ্দাফি সেই জল থেকে মরুভূমিতে জলসেচ শুরু করে তাকে সুজলা সুফলা করে তুলতে আরম্ভ করেছিলেন। ট্রাজেডি হলো, সেই সময়ই তিনি মন্তব্য করেন, এই একটি অপরাধের জন্যই সাম্রাজ্যবাদীরা আমাকে ফাঁসি দেবে। হলোও তাই। তার উপর তিনি ছিলেন আমেরিকার ঘোষিত শত্রু। বহুবার তিনি আমেরিকার সাথে নৌযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আমেরিকা বারবার তাকে মারার চেষ্টা করেছে। আবার সম্প্রতি তিনি ঘোষণা করেন যে ডলারের পরিবর্তে ইউরোতে ব্যবসা করবেন। এত অপরাধ সহ্য করা যায়?

এইখানে, পাঠককে লক্ষ্য করতে বলি, এই একই অপরাধে সাদ্দাম হোসেন-কেও কিন্তু আক্রমণ করা হয়েছিল। আবার ওদিকে চীন কিন্তু বহু দেশের সাথে নিজস্ব মুদ্রার বাণিজ্য বিনিময় করার ব্যবস্থা করছে। ভারতবর্ষও সম্প্রতি ইরানের সঙ্গে তেলের বাণিজ্যের ব্যাপারে ডলারকে বাদ রাখার ব্যবস্থা করেছে। আবার ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারতবর্ষ এবং চীন ঠিক করেছে তারা নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে ডলারকে রাখবে না। তাই যদি হয়, তাতেই নিশ্চিতরূপে ডলারের মূল্য হ্রাস পাবে ও আমেরিকার অর্থনীতি তাতে বিরাট ধাক্কা খাবে। তারা আর বিশ্বে এক নম্বর থাকতে পারবে না। ঠিক এমনটাই ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের ক্ষেত্রে, যখন কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিও তার হাতছাড়া হয়ে পাউন্ডের পরিবর্তে ডলারে ব্যবসা করতে থাকে। প্রশ্ন হল, ইরাক বা লিবিয়াকে আমেরিকা একতরফা মার দিয়ে দাবিয়ে দিতে পারে, চীন ও রাশিয়ার বেলায় সে কী করবে? সেখানেই যুদ্ধের সম্ভাবনা।

বস্তুত এই অনুমানের সাথে সাথে আমরা আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের দিকে এগিয়ে এসেছি— ভবিষ্যৎ কী? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স-এর একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তার জন্য চাই আলাদা পরিসর। আপাতত এটুকু বলা যায় আমেরিকার অর্থনীতির যা অবস্থা, যুদ্ধ না করে সে অস্ত্র-নির্ভর ধনতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি টিকিয়ে রাখতে পারবে না। অতএব, পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিকেন্দ্রগুলিতে যতদিন না সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় ততদিন যুদ্ধের বিপদ থেকেই যাবে।

মেনা অঞ্চলে ফিরে আসা যাক। সেখানে যুদ্ধের ফলে মানুষ তো মারা পড়ছেই, পাশাপাশি শেষ হয়ে যাচ্ছে সেকুলার ভাবধারা। বৃদ্ধি পাচ্ছে ধর্মীয়, উপজাতীয় আবেগ-তাড়িত জঙ্গিপনা। তালিবান, আল কায়দা ইত্যাদির নাম আগেই জানা ছিল, এখন তার সাথে যুক্ত হল মুসলিম ব্রাদারহুডের নাম। এই তালিকায় অতিসম্প্রতি যোগ হয়েছে ISIS। মিশরে সরকার বিরোধী অসন্তোষ বেড়ে যাওয়ার পর মুসলিম ব্রাদারহুড সংসদীয় নির্বাচনে লড়তে সক্ষম একটি সংসদীয় ফ্রন্ট তড়িঘড়ি করে খাড়া করে নির্বাচনে নামে ও জয়ী হয়। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই মিশরের মিলিটারি জুন্টা ক্ষমতা দখল করে নেয়। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় মুসলিম ব্রাদারহুডের নির্বাচনটাই গণতান্ত্রিক এবং মিলিটারি জুন্টার ক্ষমতাদখলটা গায়ের জোরে। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তিউনিসিয়া থেকে আরম্ভ করে লিবিয়া অবধি একের পর এক সেকুলার সরকার এবারে পরিবর্তিত হলো ধর্মীয় মৌলবাদীদের দিয়ে। সুতরাং এটা একটি প্রবণতা, এবং যদি ধর্মীয় মৌলবাদীদের সঙ্গে ব্রিটিশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দীর্ঘ সম্পর্কের কথা মনে রাখি তবে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে এটি একটি বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ।

মেনা অঞ্চলে দেখা গেল উপজাতীয় বিভেদকে সাম্রাজ্যবাদীরা ভীষণভাবে কাজে লাগাচ্ছে। পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে পরস্পরকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে নির্মূল করে দেওয়াটাই যেন তাদের একমাত্র কাজ। সুতরাং প্রশ্ন উঠবে, উপজাতিগুলির ভবিষ্যৎ কী? সাধারণভাবে জাতীয় সত্তার মধ্যে আত্মবিলোপই উপজাতির ইতিহাস-নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ বলে মনে করা হত, বুর্জোয়া উন্মেষের কালে যা রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, জাতীয় সত্তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে উপজাতীয় সত্তা। কোন কোন দেশে তা একেবারেই সংমিশ্রিত হয় নি, আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করছে। তবে উপায় কী? উপজাতি সত্তার মধ্যে এক পশ্চাদপদতা লুকিয়ে আছে, তা হল অন্য উপজাতি/জাতি সম্বন্ধে স্বভাবজ বিরাগের মনোভাব; তা কখনও ধরে নিদারুণ বৈরি-নির্যাতনের রূপ আর কখনও ধরে একেবারে তার বিপরীত, পালিয়ে যাওয়া বা লুকিয়ে পড়ার প্রবল ইচ্ছা। সন্দেহ নেই, এর প্রতিকার না করলে প্রকৃতির নির্মম হাতে তারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এবং সাম্রাজ্যবাদীরা কাজ করছে প্রকৃতির সেই অমোঘ নিদান রূপে। যে অস্ত্র তারা উপজাতীয়দের হাতে তুলে দিচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তা যেন শত্রু নিধনের জন্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কাজ করবে স্ব-নিধনের জন্যই। সবকটি উপজাতির সম্মিলিত প্রভাব তাদের সকলকেই বিনাশ করবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই ক্ষুদ্র-গোষ্ঠী মানসিকতার আরও একটি রূপ আছে— যেমন শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে বিরোধ। খেয়াল রাখতে হবে, আশির দশকে ইরাক ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধটা শুধু দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে হয়নি, হয়েছে ইসলামের অন্তর্গত দুটি শাখা শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে— এ কথাই আমাদের শেখাতে চায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা। খুব যত্ন করে বুঝে নিতে হবে যে ঘটনা যা ঘটছে তার থেকেও বড় কথা হলো, বুর্জোয়া মিডিয়া তাকে কী রঙ দিয়ে দেখাতে চাইছে; এবং পুনরুক্তির ভয় না করেই বলতে হবে যে সব বড় বড় আন্তর্জাতিক ঘটনাই ঘটছে

ঐতিহাসিকভাবে ক্রিয়াশীল একটি শ্রেণীর উদ্যোগে। পদানত দেশের জনগণ যখন এক হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে না লড়ে, নিজেদের মধ্যে নানান ভাগে ভাগ হয়ে লড়াই করছে এবং প্রত্যেকটি অংশকে অস্ত্র যোগাচ্ছে অস্ত্র ব্যবসায়ী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিই, তখন আমাদের বোঝা উচিত সব কিছুই চলছে কোনো এক পরিকল্পনা অনুযায়ী। আমরা পাঠককে অনুরোধ করব স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের *ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন?* (১৯৯০) বইটি দেখে নিতে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, হান্টিংটন প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সভ্যতা তথা সভ্যতার ধারক রূপে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে রয়েছে বিভিন্নতা ও ঐতিহাসিক বৈরিভাব এবং তার ফলে তাদের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। "Conflict between civilization will be the latest phase in the evolution of conflict in the modern world"। সাম্রাজ্যবাদ-লালিত সব পণ্ডিত ও মিডিয়া একদিকে তারস্বরে এর যাথার্থ্য তা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে এবং অন্যদিকে পয়সা ঢেলে বাতাবরণ তৈরি করে এবং শেষ পর্যন্ত অস্ত্র যুগিয়ে গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব বাধিয়ে সবকিছু টুকরো করার খেলায় মেতেছে। এই পরিস্থিতিতে রেনেসাঁ-উদ্ভূত সংস্কৃতিতে পাঠ না নিলে তথা সোভিয়েত সভ্যতাতে আবগাহন না করলে তাদের মুক্তি নেই। আর একটা অবশ্যকরণীয় হলো সোভিয়েত গঠনের মাধ্যমে শ্রেণী ভিত্তিতে নিজেদেরকে সংঘটিত করা তথা সোভিয়েত সংস্কৃতির চর্চা করা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এই বিরাট ধ্বংসলীলার মধ্যে জনগণের কিচ্ছু করার নেই। যদি আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে যে কোন অজুহাতে যে কোন দুর্বল দেশের উপর কয়েক সহস্র মাইল দূর থেকে মিসাইল নিক্ষেপ করা যায় বা বিপুল বাহিনী নিয়ে সে দেশটি দখল করে নেওয়া যায় তবে আর করার রইল কী? সুতরাং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধের বিপদ ভয়ঙ্কর ভাবে রয়ে যাচ্ছে, সারা পৃথিবীর জনগণের মাথার উপর ঝুলছে যুদ্ধের বিভীষিকা।

কিন্তু পরিস্থিতি যতটা অন্ধকারময় বলে মনে হচ্ছে আসলে তা সেরকম নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ইরাকে আমেরিকানরা শাসন পরিষদ তৈরি করেছে ইরাকিদের দিয়েই, নিজেরা সরাসরি কোন পদে থাকতে সাহস করেনি। এটা সাম্রাজ্যবাদের কমজোরির হওয়ার এক লক্ষণ। (যদিও শিয়া-সুন্নি বিভাজনকে সুচারুভাবে ব্যবহার করে তারা ইরাককে আরো দুর্বল করে তুলছে।) আগে সাম্রাজ্যের আমলে ভারতবর্ষের মতো দেশে যা করা সম্ভব ছিল, অর্থাৎ রানী ভিক্টোরিয়াকে ভারত-ঈশ্বরী বলে ঘোষণা করার স্পর্ধা বা ইংরেজ বড়লাটকে ভারতের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা বলে দাঁড় করানো, তা এখন আর সম্ভব নয়। যদিও ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য মোতায়েন করেছে তবুও সেখান থেকে একটা পালাই পালাই ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মৌরসিপাট্টার দিন আর নেই। ইরাক তো এখন আবার পুরোদস্তুর রণক্ষেত্র।

উপসংহার

সমগ্র উপস্থানাটিতে যেটা বলার চেষ্টা করেছি, আমেরিকা আর বিশ্বের এক নম্বর শক্তি থাকবে না। তার পতন হবেই। কথা হচ্ছে, তাতে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কী লাভ? উত্তরে বলা যায়, বর্তমান ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ফলে শুধু যে মার্কিনরা বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের একাধিপত্য থেকে সরে যাবে তাই নয়, সামগ্রিকভাবে গোটা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাটাই দুর্বল হয়ে পড়বে। সেই অবস্থায় লেনিন রাশিয়ার বিপ্লবের যেরকম ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, সেই রকম সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে এক-একটি দুর্বল গ্রন্থি হওয়ার বদলে, গোটা শৃঙ্খলটাই ঐতিহাসিকভাবে দুর্বল হয়ে যাবে। আর কে না বোঝে, সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল দুর্বল হওয়া মানে শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের মুক্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

তবে, শক্তির বিরুদ্ধে চাই শক্তি। তাই বিভিন্ন শ্রেণীগুলিকে গড়ে তুলতে হবে তাদের লড়াইয়ের সংগঠন, সোভিয়েত। গড়ে তুলতে হবে তাদের মধ্যে ঐক্য ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক নেতৃত্বে সংগ্রাম। ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, *মেনা* অঞ্চলের দেশগুলিতে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এবং অন্যান্য পদানত দেশেও যা হতে যাচ্ছে, তাতে একমাত্র ওই সোভিয়েত-এর ভিত্তিতেই জনগণ নিজেদের শাসন করতে পারে, শাসনের আর সব রূপই ঐতিহাসিকভাবে বাতিল হয়ে যাচ্ছ। আরও একবার মনে করতে হবে স্তালিনের কথা ঃ "কেবলমাত্র এখনই এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া না ছিঁড়লে, অত্যাচারিত জাতিগুলি বুর্জোয়াদের ছুঁড়ে ফেলে না দিলে, এই জাতিগুলির শ্রমজীবী জনগণের হাতে ক্ষমতা না গেলে, অত্যাচারিত জাতিগুলির মুক্তি নেই"। (স্তালিন, *অক্টোবর বিপ্লব ও জাতীয় প্রশ্ন*, ৬ ও ১৯ নভেম্বর, ১৯১৮)।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে সংকট যে জায়গায় গেছে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতাদখল একটা চেতনার স্ফুলিঙ্গের ব্যাপার। ইতিহাসের নির্মম হস্ত তাদের সেই চেতনার দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে, এ আশা করা অন্যায় হবে না।

এখনকার পৃথিবীর বিরাট বিরাট শক্তিগুলির নড়াচড়াকে তুলনা করা যেতে পারে পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্লেট টেকটোনিক মুভমেন্ট-র সঙ্গে। এর ফলে বিশাল জলোচ্ছাস, বিকট অগ্ন্যুৎপাত ও অভাবনীয় পরিবর্তন হতে বাধ্য। এবং মহাকবির গ্যয়টের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরাও বলব যে এই বিরাট ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই জন্ম হবে নতুনের। আর তার জন্য চাই পরাক্রান্ত ও পদানত ও যুদ্ধ-আক্রান্ত, উভয় জাতিগুলির মধ্যে এমন মানুষের, যারা পরিস্থিতিটা বোঝেন ও অন্যান্যদের বোঝানোর ক্ষমতা রাখেন।

মতামত - লেখকের

প্রবন্ধ

জমি এবং পর্বান্তর— উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলের জটিলতা

গোর্কি চক্রবর্তী ও অশোক কুমার রায়

ভূমিকা

জনজাতি গোষ্ঠীর জীবনধারণের অর্থনীতি (subsistence economy) এবং আধুনিক কালের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির পার্থক্য ঐতিহাসিকভাবেই মৌলিক। প্রথমটির ক্ষেত্রে, জমি থাকে কৌম অধিপতির তত্ত্বাবধানে এবং জমির উপস্বত্বে কৌমের সকল সদস্যেরই অধিকার বিদ্যমান। ফলত, বাজার অর্থনীতির সংজ্ঞায় জমির প্রকৃত মূল্য ব্যক্ত করা যায়না। অপরদিকে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে জমি হলো বাজারি পণ্য, যা লেনদেন করা যায়। সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তির উপর প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা। দুই অর্থনীতির এটাই মূলগত পার্থক্য (হার্সকোভিটস, ১৯৬৪)। দ্বিতীয়ত, জীবনধারণের অর্থনীতির ব্যঞ্জনা দ্বিবিধ। এক, কৌম নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে কৌম কর্তৃক ব্যক্তিকে সম্পত্তি প্রত্যর্পণ এবং দুই, সংশ্লিষ্ট কৌমের স্বীকৃতি ব্যতীত যেহেতু কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পত্তি অর্জন করতে পারেনা, সেইহেতু সত্ত্বাতাত্ত্বিক বিচারে ব্যক্তিগত অধিকার কৌম অধিকারের অঙ্গীভূত (টেলর, ১৯৬৬)। কৌম সম্পত্তি সামাজিক অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ার কারণে, তার যে কোনো পরিবর্তন উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটায় (কমনস, ১৯৫৭)। প্রাতিষ্ঠানিক বিধানসমূহ কৌম অনুশীলিত পরম্পরাগত বিধিগুলি থেকে সামাজিক অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্ন করে এবং পরম্পরাগত ধারার উপর প্রাতিষ্ঠানিক আইনগুলির কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এইভাবে এই সমস্ত আইন জমির কৌম চরিত্র ধ্বংস করে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভূ-চিত্র

ভৌগোলিক কারণে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের অর্থনীতি, উপত্যকায় এবং পাহাড়ি অঞ্চলে দ্বৈত চরিত্র বহন করে— দ্বৈত উৎপাদিকা শক্তি এবং দ্বৈত সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। এই দ্বৈততা আসাম, ত্রিপুরা এবং মণিপুরেও বিদ্যমান। সেখানে উপত্যকার উদ্বৃত্ত-প্রদানকারী আর্দ্রভূমি-কেন্দ্রিক (wet-land) অর্থনীতি আদি-সামন্ততান্ত্রিক শক্তির জন্ম দেয়। পাহাড়ি অঞ্চলে ঝুম চাষ এখনও বিরাজ করছে এবং এখানে কৌম সদস্যরা, উদ্বৃত্ত নয়, নিজেদের ব্যবহারের জন্যই উৎপাদন করে থাকে। উপত্যকায় আর্দ্রভূমি অর্থনীতির ফলে সম্প্রসারিত প্রাতিষ্ঠানিক রাজস্ব-প্রশাসনের উদ্ভব হয়েছিল এবং রাজকীয় লিপিতে তা বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এইসব লিপি অনুযায়ী রাজা ছিল ভূসম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে জনজাতি ভূমিতে জমির উপর রাজকীয় অধিকারের ধারণা ছিল অচল। সেখানে গোষ্ঠী-প্রধান কর্তৃত্বাধীন পৃথক এক ভূমি-ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বিচারব্যবস্থা বিষয়ে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দেশীয় ধারণা প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাত করা জরুরি। ম্যাক্স ওয়েবার-এর মতবাদে পুষ্ট ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা সম্পদ সংগ্রহ, বিশেষত জমি দখলের জন্য বলপ্রয়োগ করাটাকে আইনত সমীচীন বলে মনে করতেন। তাঁদের আইনি অভিজ্ঞান অনুযায়ী, রাজস্ব আদয়ের উপযুক্ত কিন্তু জনবসতিশূন্য, অব্যবহৃত অথবা রাজস্ব-বিহীন যে কোনো জমির আগে 'পতিত' উপসর্গ ব্যবহার করাটাকে তাঁরা অসমীচীন বলে মনে করতেন না। কিন্তু সম্পদ, বিশেষত জমি সম্পর্কে অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের ধ্যানধারণা ছিল অন্যরূপ। রাষ্ট্রীয় ব্যাখ্যার বদলে তাঁরা সামাজিক রীতিনীতির নিরিখে আইনের ব্যাখ্যা করতেন। সম্পদ ব্যবহার এবং আইনের ভিত্তি ছিল সামাজিক নীতি। জাতিগত ইতিহাসের এই ঐতিহ্য, আইনি পরিভাষায়, 'স্থানীয় প্রথার' উপর প্রতিষ্ঠিত। জমির উপস্বত্ব ভোগের ব্যবহার বিধি বলবৎ থাকার কারণে কৌমের তরফে কোনো অব্যবহৃত জমিকে পতিত বলে গণ্য করা হতো না। কারণ আশু ভবিষ্যতে এই কৌম জমি ব্যবহার করার সুযোগ বজায় থাকত।

সুতরাং, বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ভূমি মালিকানার বিন্যাসে বাহ্যিক কিছু পার্থক্য থাকলেও, এখানকার পাহাড়ী অঞ্চলে, ভূমিস্বত্বের পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাযুজ্য বিরাজমান। সমতলের তুলনায়, আদিম যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল ঝুম চাষ বৃহৎ অর্থনীতি হিসাবে পরিগণিত হতে পারেনি। প্রকৃতিগত ভাবে এটা সমস্বত্বভোগী এবং গোষ্ঠীগত জমি ও শ্রমের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কৌমজমিতে কার্যকর উদ্বৃত্তের উৎপাদন এবং সঞ্চয় হয়না (গাঙ্গুলী ২০০৮)। উপত্যকা এবং পাহাড়ী অর্থনীতিতে এটাই প্রধান পার্থক্য। এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রবন্ধে তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে— ঝুম চাষ, পরম্পরাগত বিধির জগতে সঙ্কট এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা।

ঝুমচাষে নিরুৎসাহকরণ

উদ্বৃত্ত অনুৎপাদন, ক্ষুদ্র কৃষকদের অপরিবর্তনীয়তা, দুর্বল পরিকাঠামো ও পদ্ধতি, পণ্য উৎপাদনে ব্যর্থতা, বাজারের খামতি এবং অধিক উৎপাদনক্ষম অর্থনীতির অভাব— এই সমস্ত কারণে ঝুম চাষের ক্ষুদ্র উৎপাদন প্রণালী সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। ঝুম চাষে ক্ষুদ্র উৎপাদনে নিরুৎসাহের যুক্তিটা উদ্বৃত্ত প্রদায়ী অধিক উৎপাদনক্ষম অর্থনীতির চাহিদার মধ্যে লুক্কায়িত। ভারতে উপনিবেশবাদীরা, যারা ভূমি-খাজনায় মুনাফার সন্ধান করতো, তারা সাধারণভাবে ক্ষুদ্র উৎপাদনে নিরুৎসাহ দেখাতো। উত্তর-

উপনিবেশ পর্বেও ভারত রাষ্ট্র তাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রকল্পে এই উৎপাদন পদ্ধতি খারিজ করেছিলো। ১৯৫৫ সালে তপশিলি জাতি ও উপজাতি কমিশনারের রিপোর্ট থেকে শুরু করে ২০০৭ সালের অরণ্যাঞ্চল উন্নয়নের খসড়া সম্ভাবনা প্রকল্প (Draft Perspective plan for Development of the Forestry Sector 2007) পর্যন্ত ঝুম চাষকে অলাভজনক প্রক্রিয়া বলে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রের উদ্যোগ ছিল স্থায়ী কৃষির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ফসল, উদ্যানপালন এবং শিল্পের জন্য জমি-ব্যবহারে প্ররোচিত করা। ভূমিস্বত্ব কাঠামো সরলীকরণ করার উদ্দেশ্যে 'উপজাতিদের জন্য জাতীয় খসড়া নীতিতে' ব্যক্তিগত মালিকানার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ঝুম চাষের অর্থনৈতিক ভিত্তি, উপস্বত্ব ভোগের রীতি এবং এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে জায়মান যৌথ সচেতনতা— এই সব কিছুই নস্যাৎ করা হলো। বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন এবং শিল্পের উদ্দেশ্যে ঝুম চাষের জমি ব্যবহারের জন্য ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন দপ্তরের 'জাতীয় বনসৃজন কর্মসূচি' এবং 'জাতীয় উদ্যান মিশন' কাজে লাগানো হয়েছিলো।

উপনিবেশোত্তর যুগে পলিসি পরিবর্তনের বিষয়টি বিভিন্ন গবেষণায় পর্যালোচিত হয়েছে। দেখা গেছে, ''সামাজিক অপরিহার্যতাকে কম গুরুত্ব দিয়ে, নয়া প্রযুক্তি এবং নীতিকে উৎপাদনের লক্ষ্যবস্তু করার ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে বৈষম্য, অস্থায়িত্ব এবং অস্থিরতা ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছে এবং উত্তেজনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে'' (কর্ণ ১৯৮৭)। জনজাতি গোষ্ঠীর অধিবাসীদের ঝুম চাষ থেকে স্থায়ী কৃষিতে মুখ ফেরানোর জন্য মূলধারার অর্থনৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছে, যা কিনা অনেকক্ষেত্রে আদিবাসীদের হিংসাত্মক ভূমিকা নিতে উত্তেজিত করেছে। আর্দ্রভূমি কৃষি এবং গব্যোৎপাদন পাহাড়ি অঞ্চলে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। রায় বর্মণ মন্তব্য করেছেন:

> ...উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ রাজ্যে পাহাড়ি অঞ্চলে আর্দ্রভূমি ধানচাষ এবং গব্যোৎপাদন প্রসারের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কিন্তু বেশির ভাগ পাহাড়ি অঞ্চলে, যেখানে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, আর্দ্রভূমি ধানচাষ করে অভিবাসী বাংলাদেশী হিন্দু ও মুসলমান কৃষকরা। এরা একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন। অনুরূপে গব্যোৎপাদন নেপালী শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল। পাহাড়ি মানুষ অলস বা নিরুদ্যমী বলে এটা হয়েছে, তা নয়। আসলে শস্য বিচার, বিভিন্ন পর্যায়ে মাটির চরিত্র অনুযায়ী ফসল ফলানো, সেচ, দেশীয় আবহবিদ্যা, গব্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে পশুদের হালচাল বোঝা, দেশীয় পশুচিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি সমুদয় কার্যকলাপ চলে আসছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে।... (রায় বর্মণ ১৯৯৪)

ঝুম চাষের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির অভাবের ফলে উন্নয়ন হয়েছে একপেশে, আদিবাসীদের জমি অন্য সম্প্রদায়কে হস্তান্তরের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কারণে এই অঞ্চল কোনো কোনো সময়ে রাজনৈতিকভাবে উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। ঐ অঞ্চলে আদিবাসী জমিতে অ-আদিবাসীদের বৈধ মালিকানা না থাকলেও, আর্দ্রভূমি ধান চাষে তাদের পারদর্শিতার কারণে অ-আদিবাসীরাই প্রকৃত মালিকে পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। জমি লীজ নিয়ে তারা বছরের পর বছর চাষ করে গেছেন। ধীরে ধীরে, তাঁরা জনজাতি গোষ্ঠীর ভোগদখলকারী জমিতে চাষের এলাকা সম্প্রসারিত করেছেন। উপজাতি প্রধান ও উদীয়মান অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগসাজস করে তাঁরা বেসরকারিভাবে নিজ চাষে জমি নিয়ে এসেছেন। এইরকম পরিস্থিতিতে আদিবাসী এবং অভিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে জমি-কেন্দ্রিক ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদও জনজাতি গোষ্ঠীর মনে 'স্বাতন্ত্র্য বিপন্নতার' (identity-threat) আশঙ্কার উদ্রেক করে এবং 'স্বভূমি' আন্দোলনে প্ররোচনা সৃষ্টি করে। সেকারণে এই প্রকার জমি হস্তান্তর এই অঞ্চলে অনেক সময়ে উগ্রপন্থার উৎস হয়ে ওঠে। আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরায় ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছে। পলিসিগত ভাবে স্থায়ী কৃষির প্রতি ঝোঁক দেওয়ার ফলে কৌম জমিতে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনে উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল এবং নয়া-উদারনীতি জমানায় এই পলিসি পরিবর্তন জীবনধারণের অর্থনীতিতে উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ছন্দপতন ঘটিয়েছে। সাম্প্রতিক কালে কার্বি-আংলঙ ও উত্তর-কাছাড় পার্বত্য অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ সেই একই ইঙ্গিত করে।

পরম্পরাগত অধিকারের ক্ষেত্র

কৌম অধিকার ও ব্যক্তিগত অধিকার— অর্থনৈতিক ও আদর্শগত ভাবে বিপরীত এই দুই ভূমিব্যবস্থার প্রসঙ্গে উত্তরপূর্ব ভারতে পরম্পরাগত অধিকারের ক্ষেত্রকে বুঝতে হবে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বহুবিধ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে উত্তরপূর্ব ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলে নানাপ্রকার পরম্পরাগত ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। উপত্যকা অঞ্চলে প্রাক-পুঁজিবাদী জমির কেন্দ্রীভবন প্রথম দেখা দিয়েছিল আর্দ্রভূমি ধান চাষ অর্থনীতির মাধ্যমে। সাবেক সামন্ততান্ত্রিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে। ঔপনিবেশিক এবং উপনিবেশোত্তর অর্থনীতি উপত্যকায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে আরও শক্তপোক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠা করে এবং কৌম ভূমি ব্যবস্থা ধ্বংস করে। বাজারি ব্যবস্থাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং জনজাতি সমাজের সমশ্রেণী গঠনতন্ত্র বিলীন হয়। উদারনীতি-উত্তর অর্থনীতিতে, জনজাতি গোষ্ঠীর প্রতি রাষ্ট্রের কল্যাণকামী ভূমিকা এবং সংবিধানের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তপশিলে বর্ণিত বিশেষ রক্ষাকবচগুলি সঙ্কুচিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির আধিপত্য কৌম-এর মালিকানা-সত্তা (Person)

অস্বীকার করে (রায় ও কুতি ১৯৯৮), ঝুম চাষকে পরিবেশ বিনষ্টকারী হিসাবে অপবাদ দেয় এবং ঝুম চাষের অর্থনীতিকে বাজারের অপরিণত বিকাশের উপাদান হিসাবে দায়ী করে।

মেঘালয়ের চিত্র

ষষ্ঠ তপশিলে পরম্পরাগত ভূমি-অধিকারগুলিকে সুরক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। যদিও ষষ্ঠ তপশিলে এবং স্বশাসিত জেলাসমূহে জমির প্রশ্নটি প্রথম দিকে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিলনা। বিতর্ক কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, আসাম পাহাড়ি অঞ্চলে সমতলের কর্তৃত্ব-মুক্ত রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে। ফলত ষষ্ঠ তপশিলভুক্ত অঞ্চলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং জমি আত্মসাৎ সমান্তরাল গতিতে চলে। সুরক্ষা বিধি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও মেঘালয়তে বিত্তবান এবং ক্ষমতাশালী রাজনীতিকদের মদতে 'রি-রেইড' (কৌম) জমি ক্রমাগত 'রি-কিন্তি' (ব্যক্তিগত) জমিতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে।

চিরাচরিত প্রথার অভ্যন্তরেই এই সমস্যার মূল প্রোথিত ছিল। পরম্পরাগত বিধিতে জমি ছিল সাধারণের কিন্তু দখলস্বত্ব ছিল ব্যক্তিগত। দখলিকার যদি দীর্ঘকাল জমি চাষ না করে ফেলে রাখে, সে দখলস্বত্ব হারাবে। উপরন্তু, কেউ জমিতে স্থায়ী উৎকর্ষসাধন করে দখল বজায় রাখলে, কালক্রমে সেই জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। পরম্পরাগত প্রথায় দখলস্বত্ব বিধি ধনবানদের সুবিধা করে দিয়েছিল (নঙগ্ব্রি ১৯৯৫)। অর্থাভাবের কারণে, দরিদ্র কৃষকের জমির উৎকর্ষসাধনের ক্ষমতা ছিলনা। ফলত কৌমজমিতে ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেও সে ছিল অক্ষম। অপরদিকে, ধনাঢ্য ব্যক্তিরা অধিক ফলনের জন্য অনেক বেশি শ্রমিক ও উপকরণ যোগান দিতে পারতো, বাণিজ্যিক ফসল চাষ করতে পারতো এবং জমির স্থায়ী উৎকর্ষসাধন করতে পারতো। কৌম জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপনে তারা সক্ষম ছিল। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, অভিজাতরাই প্রথম 'রেইড দরবারে' 'রি-কিন্তি' অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। পরে অন্যরা যোগ দিয়েছিল। এইভাবে, যারা কৌম জমির মালিক ছিল এবং যারা ছিলনা, দখলস্বত্ব আইন তাদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছিল (দত্ত ১৯৯২)

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবহন ব্যবস্থায় উন্নতি, এবং বাণিজ্যিক ফসলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে জমির কেন্দ্রীভবনের গতি আরও বৃদ্ধি পেল। যতটা পারা যায়, ততটা রেইড জমি দখল ও অধিকার করার উন্মাদনা ছিল ক্রমবর্ধমান। যাদের হাতে নগদ অর্থ ছিল, তারা, কৌমকে বঞ্চিত করে, বৃহৎ বৃহৎ বেষ্টনীর মাধ্যমে রেইড জমি ঘিরে ফেলতে শুরু করে। পরম্পরাগত বিধিও রেইড-বহির্ভূত মানুষকে কৌম জমির দখল নিতে এবং জেলা পরিষদ থেকে পাট্টা পেতে সুবিধা করে দিয়েছিল। জমি যারা হারিয়েছিল, তারা ছিল রেইড অন্তর্ভুক্ত আর জমি যারা কুক্ষিগত করলো, তারা ছিল নগরবাসী (সেন ১৯৮৩)। রি-কিন্তি জমিতে পাট্টা প্রদান করে আর্থিক মুনাফা করার ব্যাপারটা 'সিয়েম' (নির্বাচিত প্রধান) এবং 'কি মন্ত্রী'-রা (প্রশাসক) হৃদয়ঙ্গম করে। ক্রমে ক্রমে সিয়েম-রা তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে রি-রেইড জমিতে পাট্টা বিতরণ এবং পরম্পরাগত বিধি লঙ্ঘন করে অর্থ উপার্জন করতে শুরু করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি গোষ্ঠী সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, রি-কিন্তি জমিও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে বিভক্ত হয়ে গেছে। খাসি গ্রামের এই চিত্র গারো গ্রামগুলিতেও দৃশ্যমান। সেখানেও অনুরূপ পদাঙ্ক অনুসরণ করে একদল পরবাসী ভূস্বামীর আবির্ভাব হয়েছে (মজুমদার ১৯৮৩)।

এই প্রক্রিয়ার আর একটা দিক আছে। লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কৌমের পুরুষ সদস্যদের দ্বারাই জমি-গ্রাসের সকল ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এমনকি যে রি-রেইড জমি দখল করা হয়েছে, সেগুলিরও তদারকি করতো 'দরবার শ্নং/দরবার রেইড' (গ্রাম পরিষদ) অথবা 'দরবার হিমা' (গোষ্ঠীপ্রধান) এবং 'রাংবা শ্নং' (সর্দার)— সবগুলোই পুরুষ পরিচালিত সংস্থা। তারা পরিষদ বা সংস্থার অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে শলা করে বিপুলায়তন রেইড-জমি ব্যক্তিগত (রি-কিন্তি) জমিতে রূপান্তর ঘটিয়েছে। অরণ্যভূমির ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি মাত্রায় ঘটেছে। পরিণামে, মাতৃকুলভিত্তিক খাসি সমাজে নারীদের অবস্থান ভূমি-স্বত্বাধিকারী থেকে কৌলিক সম্পত্তির নিছক উত্তরাধিকারে পর্যবসিত হয়েছে, সমস্ত সামাজিক দায় সমেত (নঙগ্ব্রি ১৯৯৫)।

সামাজিক সুরক্ষা বন্ধনীর ক্ষেত্রে কৌম-জমির ভূমিকা দ্রুত অন্তর্হিত হচ্ছে। মূলধনী শক্তির অভাব এবং অতিকর্ষিত জমি থেকে ক্রমহ্রাসমান আয়, এই দুই কারণে গ্রামাঞ্চলের অনেক খাসি চাষবাস ছেড়ে মজুর-শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। নগরবাসী এবং বিত্তবান খাসিরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা নিয়ে বাগিচা ও কৃষিব্যবসায় (plantations and agribusinesses) মনোনিবেশ করায় পরবাসী ভূস্বামীতন্ত্রের (absentee land-lordism) বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে। 'দরবারগুলির' সঙ্গে তারা যোগাযোগ গড়ে তোলে এবং এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে তারা জমির দালালে পরিণত করে। সেই কারণে সরকারের জমি জরিপ কার্যক্রম উঠতি ধনী সম্প্রদায় এবং 'দরবার'-এর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ষষ্ঠ তপশিল খাসি উপজাতি সমাজে ভূমি-বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। 'দরবার' এবং জেলা পরিষদ, উভয়ই, জমির ব্যক্তিমালিকাধীন হওয়ার প্রক্রিয়া রোধ করতে অসমর্থ (শর্মা ১৯৮৪)।

এই প্রবণতা রুখতে এবং নীতিজ্ঞানবর্জিত জমিদস্যুদের কবল থেকে দুর্বল মানুষদের স্বার্থরক্ষার নিমিত্তে মেঘালয় ভূমি সংস্কার কমিশন (১৯৭৪) পরম্পরাগত অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ করার, দাগওয়ারী জরিপ এবং স্বত্বলিপি প্রস্তুত করার সুপারিশ

করেছিল। সুপারিশ কাগজেকলমেই থেকে যায়। প্রভাবশালী ভূস্বামী গোষ্ঠী আশঙ্কা করেছিল, ভূমি সংস্কার রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের পথ সুগম করবে এবং সেকারণে তারা কমিশনের উদ্যোগ ব্যাহত করে। কৌম অধিকারের অবক্ষয় এবং বিধিসম্মত সম্পত্তি অধিকারের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের অভাবে ভূমি জোতের ক্ষেত্রে উপজাতিদের ভিতর বৈষম্য বর্ধমান এবং ভূমিহীনতার উদ্ভব হয়েছে (বেজবরুয়া ২০০৭)।

সমাজের ক্ষমতাবান শ্রেণী কয়লা খনিরও একচেটিয়া দখল নিয়েছে। ষষ্ঠ তপশিলে খনিখনন বিষয় সেরকম নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। যার ফলে সিয়েম এবং খনি কোম্পানিগুলির মধ্যে একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সরকার খনি বিস্তারের ক্ষেত্রে কোনরকম হস্তক্ষেপ করেনি, খনি মালিকদের সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ ব্যয় বহন করতেও বাধ্য করেনি (কার্লসন ২০১১)। খনি খননের কার্যকলাপ মায় গর্ত খুঁড়ে খনি খনন প্রক্রিয়া (rat-hole mining) প্রায় সর্বত্র অনিয়ন্ত্রিত এবং আদিম সঞ্চয়ের এ এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্রিটিশরা প্রথম এইসব প্রক্রিয়া শুরু করে। খাসি প্রধানদের প্রদত্ত সনদের মাধ্যমে, পাহাড়ি অঞ্চলে চুনা পাথর সহ, সমগ্র খনিজ সম্পদের উপর ব্রিটিশরা প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার বলবৎ করে (মুখিম ২০০৫)। এত বছর পরেও ঔপনিবেশিক চিন্তাধারায় কোনো পরিবর্তন আসেনি।

ত্রিপুরার চিত্র

ঝুমিয়াদের পুনর্বাসন কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরা সরকারের বনবিভাগ, জনজাতি মানুষদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রবার বাগিচা নির্মাণে উৎসাহ দিতে শুরু করে। এটা জনজাতিদের শ্রম সংগঠনটিকে বিপরীতমুখী করে এবং সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক সংহতি বিনষ্ট করে। ঝুম চাষের জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল অনুপস্থিত। ঝুমিয়া পুনর্বাসন কলোনীগুলিতে, জমি প্রাপকদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে যে জমি দেওয়া হয়েছিল, তাতে তারা স্থায়ী ব্যবহারিক অধিকার, দখলস্বত্ব এবং উত্তরাধিকার ভোগ করতো। ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন (১৯৬০) হাল-চাষে পরিবর্তনে উৎসাহ দান করলেও গরিব আদিবাসীদের পক্ষে সেটা সহজ ছিলনা। অ-আদিবাসী অভিবাসীরাই কেবল হাল চাষ অবলম্বন করে এবং গরিব আদিবাসীরা দিনমজুরে পর্যবসিত হয়ে মহাজনদের খপ্পরে পড়ে।

ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার আইনের ১৮৭ ধারায়, কালেক্টরের বিনা অনুমতিতে আদিবাসী জমি অ-আদিবাসীদের হস্তান্তরে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এই ধারা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত এবং নথিভুক্ত জমির ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ আদিবাসী জমি কৌম-অধীন এবং অ-নথিভুক্ত। এর ফলে এই জমিগুলি খাস জমি হিসাবে দখল করতে এবং পুনর্বাসনের নামে উদ্বাস্তুদের বন্দোবস্ত করতে সরকারের সুবিধা হয়েছে। সরকার উদ্বাস্তুদের জমি কিনতেও উৎসাহ যুগিয়েছে এবং তার জন্য নগদ সাহায্যও মিলেছে। বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের হাতে আদিবাসীরা প্রভূত জমি হারিয়েছে। বেশ কয়েকজন বাঙালী উদ্বাস্তু নেতা, জনজাতি সংরক্ষণ বিধান উপেক্ষা করে (উত্তর ত্রিপুরার 'স্বস্তি সমিতি'র মতো) 'ভূমি সমবায়'গঠন করেছেন এবং আমলাদের সঙ্গে যোগসাজসে বিশাল পরিমাণ জমি দখলে নিয়েছেন। এইসব ঘটনা অনেক আদিবাসী যুবককে 'সেংক্রাক' (দৃঢ়বদ্ধ মুষ্ঠি) আন্দোলনে যোগদান করতে প্ররোচিত করেছে (ভৌমিক ১৯৯৬)। দক্ষিণ ত্রিপুরার কোনো কোনো এলাকায় ৬০ শতাংশের মতো জমি উপজাতিদের হাতছাড়া হয়েছে (দেববর্মা ২০০৮)।

জনসাধারণের জন্য মানেই যে তা রাষ্ট্রের সম্পত্তি, এই সার্বিক নীতি *ডামবার* বাঁধ প্রকল্পের জন্য অধিগৃহীত জমির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। সত্তর (১৯৭০) দশকের গোড়ার দিকে ডামবার বাঁধ ২৩৫৩০.৫৫ একর জমি নিমজ্জিত করেছিল। বেশিটাই জনজাতি গোষ্ঠীর জমি। জমি তারা নথিভুক্ত করেনি বলে, তাদের কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। প্রকল্পের নথিতে যদিও ২৫৫৮টি স্বজোত সম্পন্ন পরিবারের (১৩ হাজার মানুষ) কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অনুসন্ধানে দেখা গেছে ৮-৯ হাজার পরিবার (৪০-৫০ হাজার মানুষ), কোনোরকম পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণ ব্যতীত উৎখাত হয়েছে। ডামবার-এর একদা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর আদিবাসী কৃষকদের সর্বস্বান্ত হওয়ার বিপরীতে বাঙালি নগরবাসীরা বিদ্যুতের সুফল লাভ করেছে এবং বাঙালি মৎস্যজীবীরা বৃহৎ জলাধারে মাছ ধরার অধিকার পাওয়ার ফলে, তারাও কিছু সুবিধা লাভ করেছে। একইভাবে দক্ষিণ ত্রিপুরায়, গুমতি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে রাইমা উপত্যকায় আদিবাসীদের বিশাল পরিমাণ কৃষিজমি নিমজ্জিত হয়েছে। গুমতি জলবিদুৎ প্রকল্পে ২৬ হাজার একর জলে ডুবেছে, যার মধ্যে ২৪ হাজার একর কৃষিজমি। পাঁচ হাজার জনজাতি পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে (ফার্ণান্দেজ ১৯৯৫)। শুধু বিস্থাপন নয়, এর ফলে আদিবাসীদের কৌম পরিচিতিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

অশান্ত মণিপুর

মণিপুরে, পরম্পরাগত আইন এবং বিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় "Manipur Hill Peoples' (Administration) Regulation 1947" এবং "Manipur (Village Authorities in the Hill Areas) Act 1956" প্রবর্তনের পর। কুকি সর্দাররা এই আইনগুলির ভয়ানক বিরোধিতা করেছিল। কারণ এই আইনগুলির ফলে তাদের সাবেক ক্ষমতা ও পরম্পরাগত সুবিধাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। গ্রামের কর্তৃত্বকারী ব্যক্তিদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ খর্ব হয়েছিল।

১৯৮৩ সালে, মণিপুরের "Manipur (Village Authorities) in Hill Areas Act" সংশোধিত হয়। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনটি ছিল, ডেপুটি কমিশনারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত জমি অ-আদিবাসীদের হস্তান্তর বা কোনরূপ বন্দোবস্ত করা

যাবেনা। কিন্তু, জেলা পরিষদের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনারকে গ্রাম পরিষদের সম্মতি নিতে হতো। সংশোধন অ-আদিবাসীদের হাতে আদিবাসী জমি হস্তান্তর রুখতে পারেনি। মণিপুরের সেনাপতি জেলায় কুকিদের আবাসস্থল কাংপোকপি- কাংলাতোঙ্গবি অঞ্চলে অ-আদিবাসীরা পাট্টা-জমি বাগিয়ে নিয়ে বসতি স্থাপন করে।

১৯৬৭ সালে "Manipur Hill Areas (Acquisition of Chief's Rights) Act" প্রবর্তিত হওয়ার পর জটিলতার উদ্ভব হয়। এই আইনে ক্ষতিপূরণ নির্ভর করত— ক) সর্দারদের অধীনস্থ জমির পরিমাণ, খ) সর্দারি-র অন্তর্ভুক্ত পরিবার সংখ্যা এবং গ) ক্ষতিপূরণ কিস্তিতে না থোক টাকা প্রদান— তার উপর। কুকি সর্দাররা এই আইনটি সম্পর্কেও আপত্তি জানায়। সর্দারি প্রথা বজায় রাখার জন্য তাঁরা রক্ষণাত্মক ভূমিকা নেন। 'মণিপুরের আদিবাসী জমি রক্ষা ও প্রত্যর্পণ কমিটি' ১৯৭৬ সালে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে আদিবাসী জমি অ-আদিবাসীদের বিক্রয়ের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নকরণের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কর্তাব্যক্তিদেরই দায়ী করেন। জমি এবং অরণ্যের উপর তাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের সপক্ষে তাঁরা অভিমত পেশ করেন। জমিদারদের সঙ্গে তাঁদের একাসনে রাখার বিরুদ্ধে কুকি সর্দাররা প্রতিবাদ করেন। তাঁরা ১৯৬৭ সালের সর্দারি প্রথা বিলোপ আইনের বিরোধিতা করেন। ১৯৮৪ সালে মণিপুর সদর পাহাড়ি কুকি সর্দার সংগঠন স্পষ্ট দাবি করে যে কুকি জনজাতি গোষ্ঠীতে সর্দারি এক অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। জমির উপর সর্দারদের অধিকার কৌমের অর্থনৈতিক জীবনকে কখনও প্রভাবিত করেনি বরং জনজাতি এলাকায় কার্যকরী সুরক্ষা প্রদান করেছিল (রায় ও কামখেনথাংগ ১৯৯১)।

১৯৬০ সালের 'মণিপুর ভূমি রাজস্ব এবং স্বত্বলিপি আইন'-টির রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলে সম্প্রসারণ আর একটি গুরুতর সমস্যা ঘনিয়ে তোলে। মণিপুরের নাগা ও কুকি উপজাতি এবং মণিপুরের ছাত্র সংগঠন (ATSUM), মণিপুর ভূমি সংস্কার আইন মোতাবেক জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে ষষ্ঠ তপশিলের পক্ষে জোরালো দাবি তোলে। চার ধরনের নিয়মরীতি মণিপুরে চার ধরনের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল— কুকি-চিন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সর্দারি ব্যবস্থা, নাগা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কৌম ও গ্রামসমাজ, ভূমি সংস্কার আইনে সরকার এবং পাহাড়ে চলমান আন্দোলনের দাবি অনুযায়ী জেলা পরিষদ। মণিপুরের ভূমিব্যবস্থা এর ফলে জটিল আকার ধারণ করে।

জেলা পরিষদ ও ভূমি প্রশাসন

'আসাম উত্তর-পূর্ব সীমান্ত জনজাতি এবং বহির্ভূত অঞ্চল' প্রসঙ্গে বরদলৈ সাব-কমিটি রিপোর্টে (১৯৪৭) আসামের পাহাড়ি অঞ্চলে জেলা পরিষদ গঠনের সুপারিশ করে। সংবিধানের ২৪৪(২) ধারা অনুসারে তা ষষ্ঠ তপশিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রধান জনজাতি গোষ্ঠীগুলি ছাড়াও অন্যান্য যে গোষ্ঠীগুলি আছে, তাদের জন্য কমিটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠনেরও সুপরিশ করে। এইভাবে তদানীন্তন আসামের পাহাড়ি অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত 'যুক্ত খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলা', 'গারো পাহাড় জেলা', 'লুসাই পাহাড়', 'নাগা পাহাড় জেলা', 'উত্তর কাছাড় পাহাড় জেলা' এবং 'মিকির পাহাড় জেলা' ষষ্ঠ তপশিল ভুক্ত হয়। সম্প্রতি ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তপশিল সম্প্রসারিত হয়েছে।

জমি থেকে পাহাড়ি অধিবাসীদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রতিকার করার জন্য বরদলৈ কমিটি ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছিল। কমিটির অভিমত ছিল যে, কৃষি ও অকৃষি কাজের উদ্দেশ্যে পাহাড়ি অঞ্চলে অভিবাসন ঠেকাবার জন্য, পাহাড়ের মানুষের যতটা সম্ভব সুরক্ষা থাকা উচিত। প্রাদেশিক সরকারের উপর পাহাড়ের অধিবাসীদের যথেষ্ট আস্থা না থাকার জন্য, অতিরিক্ত সাংবিধানিক সংস্থান ও রক্ষাকবচ থাকা প্রয়োজন। রিপোর্টে আরও বলা হয়—

> পাহাড়ের অধিবাসীগণ এক উদ্দীপ্ত ঐকমত্যে পৌঁছন যে, অভিবাসন এবং বহিরাগতদের জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন এবং এই নিয়ন্ত্রণ পাহাড়ের অধিবাসীদের উপরই ন্যস্ত থাকা উচিত। ...আমাদের সুপারিশ হলো, ১৮৯১ সালের আসাম ফরেস্ট রেগুলেশন এবং বিবিধ আইন-এর অধীন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জমি ব্যতীত অন্য সমস্ত জমির দখল ও ব্যবহার সংক্রান্ত বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা পাহাড়ি জেলাগুলির থাকা উচিত। (হানসারিয়া ২০০৫)।

অরণ্য প্রসঙ্গে রিপোর্টে উল্লেখিত হয়—

> আমরা এই বিষয় খুব জোর দিতে চাই যে বন কর্মচারী নিয়োগ এবং লীজ-কন্ট্রাক্ট অনুমোদন সহ অরণ্যের প্রকৃত পরিচালনার ক্ষেত্রে পাহড়ের অধিবাসীদের সংবেদনশীলতা ও যথাযথ আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দেওয়া উচিত এবং প্রাদেশিক সরকারের কর্মপন্থায় এই নীতি গ্রহণ করা কাম্য। (হানসারিয়া ২০০৫)।

ঝুম চাষ প্রসঙ্গে রিপোর্টের বক্তব্য—

> ঝুম চাষে অনুমতি দেওয়া হবে কি হবেনা, তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার জনজাতি গোষ্ঠীগুলির উপর ন্যস্ত থাকা উচিত।... যদিও আমাদের দৃঢ় অভিমত, ঝুম চাষ যথাসম্ভব নিরুৎসাহিত এবং বন্ধ করা প্রয়োজন, কিন্তু স্থানীয় পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা না করে সাধারণভাবে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা ঠিক হবেনা। (হানসারিয়া ২০০৫)।

ষষ্ঠ তপশিলের ৩(১) ধারায় ভূমি সংক্রান্ত বিধানগুলি উল্লেখিত হয়েছে। এই ধারায় জেলা পরিষদগুলিকে জমি সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ধারা অনুসারে, জেলা পরিষদ সংরক্ষিত অরণ্যের জমি ব্যতীত

অন্যান্য সকল প্রকার জমি কৃষি, গোচারণ, বসবাস কিংবা অন্য কোনো অকৃষি ব্যবহার অথবা গ্রাম বা শহরের অধিবাসীদের উন্নতি বিধানের নিমিত্তে বন্দোবস্ত, দখল, ব্যবহার অথবা পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে, এই আইনের কোনো কিছুই সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে বাধ্যতামূলক জমি অধিগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। অনুরূপে, ৮ নং ধারায় ভূমি খাজনা নির্ধারণ, সংগ্রহ এবং কর ধার্যের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে ষষ্ঠ তপশিল সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার ফলে আইনি জটিলতা বেড়েছে। সুনীল দেব বনাম ত্রিপুরা মামলায় সাব্যস্ত হয়েছিল যে, জেলা পরিষদ ৩(১)(ক) ধারায় উপজাতি এলাকায় জমি দখল বা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করতে পারে। বন্দোবেস্তের সর্বনিম্ন মাত্রা, কৃষিজমিকে অকৃষি জমিতে পরিবর্তন নিষিদ্ধকরণ এবং জমির ভিন্নমুখী ব্যবহারে বাধাদানের উদ্দেশ্যে পরিষদ বিধি প্রণয়ন করতে পারে। গোচারণ এবং সামাজিক বনসৃজনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য জমির কিছু অংশ নির্দিষ্ট রাখতে পরিষদ ভূমি দখলকারীদের বাধ্য করতে পারে। জমির সঠিক, কার্যকরী এবং হিতকর ব্যবহারের প্রতি নজরদারির জন্য পরিষদ নিজস্ব পরিকাঠামো গঠন করতে পারে। দরিদ্রতর অংশের সাহায্যার্থে যৌথ খামার নির্মাণের জন্য, নিজ সীমানার মধ্যে জমির কিছু অংশ ফাঁকা রাখতে জমির অধিকারীকে বাধ্য করার জন্য, পরিষদ আইন জারি করতে পারে। তরিমাকান্ত দাস বনাম কার্বি-আংলং জেলা পরিষদ ১৯৮৯ (১) জিএলআর ১৪৭ এবং উদালদাস পানিকাপ্রহ্লাদ চন্দ্র দাস বনাম কার্বি-আংলং জেলা পরিষদ ১৯৯০ (১) জিএলআর ৭৮ মামলায় রায় হয়েছিল, স্বশাসিত জেলাগুলির অন্তর্ভূক্ত জমিগুলির মালিকানা জেলা পরিষদের নয়, রাজ্য সরকারের (হানসারিয়া ২০০৫)। ফলত জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠানের বিধান প্রণয়নের যোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে উপস্থাপিত United Khasi and Jaintia Hills vs. Sitimon Sawin, 1971 মামলা উল্লেখ করে বিচারপতি হানসারিয়া জেলা পরিষদের বিধায়ী ক্ষমতা প্রসঙ্গে বলেন, সংসদ অথবা বিধানসভার বিপরীতে জেলা পরিষদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। উপরন্তু, তপশিলে জমি-মালিকানার উপর কর্তৃত্ব এমনভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে যে তা 'মালিকানার' পরিবর্তে স্বতই 'ব্যবহার' ও 'দখলিস্বত্ব'-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। বিচারপতি হিদায়তুল্লা এই ব্যাখ্যাও খণ্ডন করেছিলেন।

অপরদিকে গৌহাটি হাইকোর্ট United Khasi-Jaintia Hills Autonomous District (Management and Control of Markets) Act,1953-এর বৈধতা ঘোষণা করে। এই আইন অনুযায়ী হাট-বাজার বন্দোবস্ত করা হয়। হাইকোর্টের বক্তব্য ছিল, ৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জেলা পরিষদ, অধিবাসীদের উন্নতিকল্পে, বাজার সহ যে কোনো উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে পারে। ৮ নং অনুচ্ছেদে জেলা পরিষদকে করধার্যের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সেটাও উল্লেখ করা হয় (হানসারিয়া ২০০৫)।

জমি (বনভূমি সমেত) ষষ্ঠ তপশিলের সবথেকে ঝঞ্ঝাটপূর্ণ বিষয় হওয়ায়, সর্দারি প্রতিষ্ঠান এবং জেলা পরিষদের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। খাসি-জয়ন্তিয়া এলাকায় এটা প্রত্যক্ষ করা যায়। পরস্পরকে অতিক্রমণ করা শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক যুগে। সাইমন কমিশনের নিকট প্রদত্ত স্মারকলিপিতে, *সিয়েম*-রা তাঁদের ডেপুটি কমিশনারের অধীনস্থ করার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। উপনিবেশোত্তর যুগে যখন তাঁরা তাঁদেরকে জেলা পরিষদের অধীনস্থ করার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়, অনুরূপ উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয় (হানসারিয়া ২০০৫)। জেলা পরিষদ এবং সর্দারদের কাজকর্মে একই ধরনের বিশৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক অতিক্রমণ চলতে থাকে। ফলত নিয়ত মামলা-মোকদ্দমা, নানাবিধ ব্যাখ্যা, পর্যায়ক্রমে সংশোধন এবং আইন বলবৎ করার ক্ষেত্রে ঘাটতি— আইনের সুরক্ষার প্রেক্ষিতটাই শেষ পর্যন্ত অবান্তর হয়ে যায়।

প্রথম দিকে, মেঘালয়ে জেলা পরিষদ গৃহ-কর এবং ভূমি খাজনা আদায় করত। কিন্তু খাসি এলাকায় এই কাজটা করত *সিয়েম* এবং প্রধানরা। জেলা পরিষদ যখন সমস্ত বাজারগুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলো, তখন সিদ্ধান্ত হলো পরিষদ অর্ধেক রাজস্ব পাবে। কিন্তু পরবর্তী সংশোধনী মারফত ব্যক্তিমালিকানাধীন বাজারগুলি ব্যতীত *সিয়েম, দলোই, সর্দার* প্রভৃতির অধীনস্থ সকল বাজার বিলোপ করে দেওয়া হলো। জয়ন্তিয়ায় বাজার ব্যক্তিমালিকানাধীন হওয়ায় পরিষদ রাজস্ব পেত। অপরদিকে খাসি অঞ্চলে তা পরিহার করা হলো। অনুরূপে জয়ন্তিয়ায় গৃহ-কর ও গোচারণ খাজনা পরিষদ আদায় করতো। কিন্তু খাসি এলাকায় ঘটনা ছিল অন্যপ্রকার (দত্ত ২০০২)।

বিধানিক ক্ষেত্রেও খাসি স্বশাসিত জেলা পরিষদ প্রণীত আইনের সঙ্গে রাজ্য আইনের সংঘাত বাধে। সরকার প্রণীত Meghalaya Forest (Removal of Timber) Regulation Act, 1981-এর সঙ্গে পরিষদ প্রণীত United Khasi Jaintia Autonomous Hill District (Management and Control of Forest) Rules, 1960- এর বিরোধ থাকায়, প্রশাসন পরিষদ অনুমোদিত ট্রানজিট পাশগুলির সাংঘাতিক বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। Meghalaya (Khasi and Jaintia Succession of Self Acquired Property) (Special Provision) Bill 1984 রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাওয়ায় রাজ্যপাল The Khasi Hills Autonomous District Council (Inheritance of Self-acquired) Property) Bill 1980-এ সম্মতি দেননি (চৌবে ১৯৯৯)।

আদিবাসী জমি অ-আদিবাসীদের হস্তান্তরযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও Meghalaya Transfer of Land (Regulation)

Amendment Act, 2012 দান, বিক্রি, বিনিময়, বন্ধক, লীজ ইত্যাদি মাধ্যমে জমি হস্তান্তরে অনুমোদন দেয়। এছাড়া পরবর্তী স্তরে আরও নানাবিধ পরিবর্তন ভূমি-বিচ্ছিন্নতা ত্বরান্বিত করে। খাসি স্বশাসিত জেলা পরিষদ অর্থলগ্নিকারী সংস্থাগুলির নিকট জমি বন্ধক রাখার জন্য 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' দিতে শুরু করে। বিভিন্ন ব্যক্তিকে পাট্টা দেওয়াও শুরু হয়। 'মেঘালয় জমি হস্তান্তর আইন'-এ প্রচুর ছিদ্র ছিল। এই আইনে এমন ধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছিল, যার বলে আদিবাসী স্বার্থে যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে জমি হস্তান্তর করা যেত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি এইরকম ছাড়-এর তালিকাভুক্ত ছিল। খনি-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার্থে আইনটাকে যথেষ্ট লঘু করে দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে Meghalaya Private Universities (Regulated & Establishment & Maintenance of Standard) Act 2012 নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। আইনটির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠেছে এবং নাগরিক সমাজে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। 'ভূমি বিচ্ছিন্নতা বিরোধী মেঘালয় সামাজিক সংগঠন সমূহ' (SOMALA) আইনটি প্রত্যাহারের দাবি তুলেছে (জিরোয়া ১৯৮৮)।

২০১২ সালের 'মেঘালয় খনি ও খনিজ নীতি' রাজ্যের ষষ্ঠ তপশিল ভুক্ত অঞ্চলে জমির ব্যক্তি মালিকানাধীনিকরণ প্রক্রিয়ায় নতুন এক মাত্রা যোগ করে। এই নীতি অনুসারে, যে এলাকায় খনিজ উত্তোলন হবে, সেখানকার ডেপুটি কমিশনার মারফত ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ এবং জমি অধিকারির 'না আপত্তি' সহ রাজ্য সরকারের নিকট দরখাস্ত পেশ করতে হবে। ষষ্ঠ তপশিল এবং ১৯৭১ সালের 'মেঘালয় জমি হস্তান্তর আইন'-এর 'নীতিগত উদ্দেশ্যে'র (policy objective) সঙ্গে প্রকল্পটিকে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

ব্যক্তি মালিকানাধীনতার হাত থেকে আদিবাসী জমি রক্ষায় ষষ্ঠ তপশিল এবং 'মেঘালয় ভূমি হস্তান্তর আইন ১৯৭১' উভয়ের অকর্মণ্যতা, রাষ্ট্রের কল্যাণকামী ভূমিকা থেকে পশ্চাদপসরণ এবং জমি ব্যবস্থায় দোস্তি পুঁজিবাদকে (crony capitalism) আবাহনের পরিপ্রেক্ষিতে 'নীতিগত উদ্দেশ্য' বিচার করা প্রয়োজন। পলিসিতে বলা হয়েছে, ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ৩ নং বিধি দ্বারা মাইনিং লীজ নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু এই ধরনের বিধানই গভীর জন-সমালোচনার সম্মুখীন। কিন্তু রাজ্য তার ভূমিকা পাল্টাচ্ছে না। ৪০ বছর আগে প্রণীত 'মেঘালয় জমি হস্তান্তর আইন' কাজে লাগিয়ে জমি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে হস্তান্তর/ বিক্রি/ লীজ/ সাব-লীজ দেওয়া হয়ে গেছে (মেঘালয় টাইমস ২৪ অক্টোবর ২০১৩)। মেঘালয়ের ষষ্ঠ তপশিল ভুক্ত এলাকার_চিত্র ভূমি-সম্পদের আদিম সঞ্চয়ের এক বেনজির কাহিনী উপস্থাপন করে।

উদ্বৃত্ত জলবিদ্যুৎ

ঔপনিবেশিক যুগে, যে জমি থেকে সরকারের আয় হতো না এবং যে জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার বর্তায় নি, সেই জমিকে 'পতিত জমি' (wasteland) হিসাবে গণ্য করা হতো। আর উদারনীতির যুগে, যে জল বাস্তব অর্থনৈতিক লাভ না এনে শুধু নদীবক্ষে বয়ে যায়, তাকে 'অপব্যয়িত জল' (waste water) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। মুক্ত জলপ্রবাহকে রাষ্ট্রের জন্য রাজস্ব এবং বেসরকারি সংস্থা অথবা রাষ্ট্রিয় এজেন্টদের জন্য মুনাফা অর্জনের স্বার্থে কাজে লাগাতে হবে। রাষ্ট্রিয় উন্নয়নের সংজ্ঞায় জলবিদ্যুৎ নতুন কিছু নয়, কিন্তু সম্ভাব্য 'জলশক্তি'কে 'জল-সম্পত্তি'তে (hydropower into hydro-dollars) পরিণত করা উদারনীতির অবদান। সঞ্জীব বরুয়া, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জলবিদ্যুৎ নিয়ে মাতামাতির বর্ণনা করতে (২০১২) মাইকেল বুরাওয়ে-র উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, "সংস্কার-উত্তর ভারতে রাষ্ট্র এবং বাজারের যোগসাজসে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি চলছে... দৈনন্দিন জীবনে পণ্যায়ন এবং সাধারণের সমস্ত বস্তুকে ব্যক্তি মালিকানাধীন করতে তারা যুগ্মভাবে উৎসাহ দিচ্ছে" (বুরাওয়ে ২০০৫)।

সাম্প্রতিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পুরো ভাবনাটাই বিতর্ক-মূলক। সিকিম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের জলবিদ্যুৎ সামর্থ্য, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের অভিমতে ৬৩২৫৭ মেগাওয়াট। এখনও পর্যন্ত মাত্র ১০১১ মেগাওয়াট অর্থাৎ ১.৬ শতাংশ রূপায়িত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র বেসিনের জলবিদ্যুৎ সামর্থ্য সবথেকে বেশি হওয়ায় তার গতিপথে ১৬৮টি প্রকল্প পরিকল্পিত হয়েছে (সারণি)।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অনুমিত জলবিদ্যুৎ ক্ষমতা ও রূপায়ণ (মেগাওয়াট)

রাজ্য	*অনুমিত ক্ষমতা**	*রূপায়ণ*
অরুণাচল	৫০৩২৮	২৮১
আসাম	৬৭৪	২৫০
মণিপুর	১৭৮৪	১০৫
মেঘালয়	২৩৯৪	১৮৫
মিজোরাম	২১৯৬	০
নাগাল্যান্ড	১৫৭৪	৯১
ত্রিপুরা	২১	১৫
সিকিম	৪২৮৬	৮৪
উত্তর-পূর্বাঞ্চল	৬৩২৫৭	১০১১

* ৩ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে

উৎস: http://northeast.nic.in/power.htm

২০১০ পর্যন্ত, অরুণাচল সরকার ৪০১৪০.৫ মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদনের জন্য ১২০টি প্রকল্প প্রাইভেট এবং ১২টি সরকারি সংস্থাকে (মোট ১৩২টি প্রকল্প) বরাত দিয়েছে। প্রায় সবকয়টি প্রকল্পে, বিপুল পরিমাণ অর্থ অগ্রিম প্রদান করা

হয়েছিল, ''যার ফলে পরবর্তী প্রকল্পগুলিতে অনেকটা সমঝোতা করতে হয়েছিল কারণ ডেভালপার এবং রাজ্য সরকার, উভয়েই এই প্রকল্পগুলিকে ভবিতব্য বলে ধরে নিয়েছিল।''(ভাগোলিকার ও দাশ ২০১০)। জলশক্তিকে 'জল-সম্পত্তি'-তে পরিণত করতে বিশাল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত মূল্য প্রদান করতে হচ্ছে।

জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির ফলাফল মূল্যায়নে, সরকার আরো একবার ঝুম চাষের বিবিধ অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে অনীহা কিংবা অজ্ঞতা প্রকাশ করল। প্রকল্পের নথিতে জলাধারে নিমজ্জিত অঞ্চলগুলিকে ''নিকৃষ্ট জমি'' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা তাদের বোধগম্য হয়নি যে ঐ নিকৃষ্ট জমিগুলিই ঝুম চক্রের শেষে আবার কর্ষণ করা হবে। তাদের ভাবনার জগৎ ছিল, যা কিছু 'বৃহৎ', তা নিয়ে। যা কিছু 'ক্ষুদ্র', তা ছিল বিরক্তিকর। প্রকল্প বিশ্লেষণে প্রায়শ বলা হতো, অরুণাচল প্রদেশে ''ক্ষুদ্র'' সংখ্যক মানুষ কেবল বিস্থাপিত হবে। কিন্তু সমগ্র ভারতের তুলনায় যেটা ক্ষুদ্র, সংশ্লিষ্ট রাজ্যে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর বিচারে সেটা বেশ ''বৃহৎ'' হতে পারে। 'Idu Indigenous Peoples Forum'-এর সভাপতি ডঃ মিতে লিঙ্গির কথায়, ''এই প্রকল্পগুলিকে বেচার জন্য 'ক্ষুদ্র বিস্থাপন' যুক্তির অর্থ কল্যাণকর আবশ্যিকতাগুলির বিরোধিতা। ইদু *মিশমি* উপজাতির মোট সংখ্যা ৯৫০০। অরুণাচলের দিবাং উপত্যকায় আমাদের বাসস্থানে ১৭টি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পরিকল্পিত হয়েছে। এই ভ্রমাত্মক যুক্তি অনুযায়ী, আমাদের সমস্ত জনসংখ্যাও যদি উচ্ছেদ হয়ে যায়, তবুও তা সামান্য সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।''(ভাগোলিকার ও দাশ ২০১০)।

ছোট ছোট কন্ট্রাক্টের প্রলোভন, জমির জন্য কিছু মূল্য প্রদান, সংযোগ বৃদ্ধিতে নতুন নতুন সেতু নির্মাণ— এইগুলোই সংকট সৃষ্টি করেছিল। ক্ষুদ্র জনজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এই বিষয়গুলো বিভাজন সৃষ্টি করে। দিবাং উপত্যকার সাংবাদিক-কর্মী রাজু মিমি এই প্রবণতাগুলি সম্বন্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ''ধোলাঘাটে লোহিত নদীর উপর একটা সেতু আমরা নিশ্চয় চাই। কিন্তু আমাদের একটা সেতু দেওয়া হবে, এই প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে সরকার, আমাদের উপর ৩০০০ মেগাওয়াটের দিবাং এবং ৪০০০ মেগাওয়াটের এটালিন প্রকল্পের মতো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চাপিয়ে দিতে পারেনা। এটা কী ধরনের সরকার? এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো হোক বা না হোক, সেতুটা আমাদের জন্য নির্মাণ হওয়া উচিত।'' (ভাগোলিকার ও দাশ ২০১০)।

যে জল-জমি-জঙ্গল বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, শেষ বিচারে তা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকার কৌম-সম্পদ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হচ্ছে— কে বা কারা এই সম্পদের অধিকারী? কে বা কারা তার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে? এবং কে বা কারা এই সম্পদ ব্যবহারে লাভবান হয়? কৃষক মুক্তি সংগ্রাম কমিটির সভাপতি অখিল গগৈ-এর ভাষায়, ''এটা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আমাদের অধিকারের বিষয়। এই সম্পদ বিদ্যুৎ কোম্পানীগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। দিল্লী এবং আঞ্চলিক রাজ্য সরকারগুলির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত রাতারাতি আমাদের নদীগুলিকে পাল্টে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের জনগণের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন এবং আগামী দিনে এই বিষযটাতেই আমরা মনোযোগ নিবদ্ধ করব।'' (ভাগোলিকার ও দাশ ২০১০)। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিষয় যারা খবর রাখেন, তাদের মনে পড়বে, এই অঞ্চলে বিভিন্ন উগ্রপন্থী কার্যকলাপের উদ্ভবের সাথে যে প্রশ্নগুলি দেখা দিয়েছিল, তা বিশেষ আলাদা কিছু ছিলনা।

উপসংহারের পরিবর্তে

'ওয়াসিংটন ঐক্য' নয়া-উদারনৈতিক বিকাশ মডেলে ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবস্থার সপক্ষে প্রবল সমর্থন জানিয়েছিল (উইলিয়ামসন ২০০০)। জন লক-এর যুক্তি অনুযায়ী, কৌম সম্পত্তি দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার পরিচায়ক, যার ফলে লগ্নী ও প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। নয়া-উদারনীতির অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের লক্ষ্য— জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থা, সরাসরি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ এবং কর্পোরেট লগ্নির পক্ষে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ধাত্রীর ভুমিকা পালন করে। বাজার ও বাণিজ্যের স্বাধীনতা উদযাপন করে, রাষ্ট্র উন্নয়নের জন্য পিপিপি মডেলের আশ্রয় নেয়। হার্ভে লক্ষ্য করেছিলেন, ''যে স্বাধীনতা মূর্ত হয়, তা ব্যক্তিগত সম্পত্তি মালিকদের স্বাধীনতা, ব্যবসা, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এবং লগ্নি পুঁজির স্বাধীনতা।'' ''সাধারণের সম্পত্তি জাতীয়করণ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন-করণের মাধ্যমে, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তর এবং অনিয়ন্ত্রিত শোষণের মাধ্যমে, সামাজিক সুরক্ষাগুলি বেসরকারিকরণের মাধ্যমে এবং সুগম বিদেশি লগ্নি ও অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে''এটা পরিস্ফুট হয় (হার্ভে ২০০৬)। এর ফলে ভূমিনীতির ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্তমূলক অপসরণ ঘটে— পুনর্বণ্টন থেকে কেন্দ্রীভবন, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয়তা থেকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তা, কৌম অধীনতা থেকে বাজারের অধীনতা এবং জমিতে সামাজিক বিনিয়োগের বদলে পুঁজি বিনিয়োগ। এই অপসরণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে কর্পোরেট প্রধানরা, ফড়ে, জমি-ফাটকাবাজ, সরকারি সংস্থাগুলি এবং কমপক্ষে আদিবাসী অঞ্চলের অধিকারের জিম্মাদাররা। রাষ্ট্র হয়ে ওঠে মূলত দমনকারী এবং কৌম জমি অধিগ্রহণ করতে রাষ্ট্র ব্যবহার করে তার সার্বভৌম ক্ষমতা (eminent domain)।

নয়া-উদারবাদী ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও কর্পোরেট

স্বার্থে কৌম জমি কব্জা করা এবং ছিনিয়ে নেওয়া। কৌম জমির সামাজিক ভূমিকা নয়া-উদারবাদী ভূমি-নীতি তুচ্ছ জ্ঞান করে। এর ফলে কর্পোরেট সংস্থা খনি, বাঁধ, পরিকাঠামো এবং অন্যান্য শিল্প প্রকল্পে পুঁজি ঢালতে সক্ষম হয়েছে। বিস্থাপনের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ দরিদ্র আদিবাসীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে। কর্মসংস্থানের উপযুক্ত দক্ষতা না থাকার কারণে এই মানুষগুলো শহুরে অসংগঠিত ক্ষেত্রে জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে এবং ঘেটো ও শহরতলিতে দিনযাপন করতে শুরু করেছে (বাসুদেবন ২০০৮)। নয়া-উদারবাদের যুগে পাহাড়ি মানুষরা আদিম সম্পদ সংগ্রহের জঘন্যতম শিকার। নয়া-উদারবাদ একমাত্রিক ভূমি-মালিকানা প্রবর্তন করার ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের জনজাতি গোষ্ঠীগুলির উপর তার প্রভাব পড়ে এবং উপজাতি গোষ্ঠী, সরকার এবং বিশ্বপুঁজি— এদের মধ্যে এক ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা গড়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র

An Interview with Prof. B.K. Roy Barman" in Datta, P.S 1994, *North East As I See It*: Omsons Publications, New Delhi

Bezbaruah M P 2007 Land Tenure System in North East India: A Constraint for Bank Financing? *Dialogue*, January-March, 2007 volume 8 no. 3

Bhaumik Subir 1996 Insurgent Crossfire: North East India Lancer New Delhi

Burawoy Michael 2005 Third wave Sociology and End of Pure Science *The American Sociologist* vol 36

Commons J R 1957*Legal Foundations of Capitalism.* The University of Wisconsin Press Wisconsin

Datta P S 1992 *India's North-East: A Study in Transition* Har-Anand Publications New Delhi

Dutta Sujit Kumar 2002 Functioning of Autonomous District Council in Meghalaya Akansha Publishing House, New Delhi

Fernandes Walter 1995 Indian Tribals and Search for an Indigenous Identity Singh AK &Jabbi MK (ed.) *Tribals in India, Development, Displacement and Discontent* Council for Social Development New Delhi

Freeman Michael 2006 (ed.) Law and Sociology vol.8 Oxford University Press New York

Ganguli J B 2008 Impact of North East Indian Tribal Values and Culture on the Hill Region's Socio-Economic

Developmentin the Pre-Plan Period- RayAsok Kumar & Chakraborty S B (ed) *Society Politics and Development in North East India- Essays in Memory of Dr. Basudeb Datta Ray* Concept Publishing House, New Delhi

Hansaria Vijoy 2005 Sixth Schedule to the Constitution Universal Law Publishing Company Private Limited, New Delhi

HarveyDavid 2006 Neo-Liberalism as Creative Destruction *Human Geography*vol 88 no 2 accessed at www. jstor.org/ stable/3878384

Jyrwa Erbanoris 1988 Critical assessment of the working of the Khasi Hills Autonomous District Council in

Meghalaya in Karna M N &Gassah L S and C.J. Thomas ed. *Power to the people of Meghalaya*, Regency Publication New Delhi

Karlsson Bengt G 2011Unruly Hills, Nature and Nation in India's Northeast, Orient BlackSwan New Delhi

Karna MN 1987 Agrarian Studies in North-East India Dutta B B&Karna M N (eds.) *Land Relations in North East India* Peoples Publishing House New Delhi

Majumdar D N 1983 The Emerging Middle Class Among the Garos Dutta Ray B (ed.) *The Emergence and Role of Middle Class in North East India*Uppal Publishing House New Delhi

Meghalaya Times, Thursday, 24 October 2013, meghalayatimes. info/index.php/front-page

Melville J 1964 *Economic Anthropology: The Economic Life of Primitive Peoples* Eurasia Publishing House, New Delhi

Menon Manju & Kohli Kanchi 2005 Large Dams for Hydropower in Northeast India Kalpavriksh- SANDRP New Delhi

MuhkimPatricia 2005 Wanted Strict Regulations on Mining Dialogue-vol. 7 no 2, October- December

Nongbri Tiplut 1995 Report on Meghalaya, Workshop on *Land Reforms- Agenda for the North East.*Gauhati papers on the North Eastern Scenario, Land Reforms Unit, Lal BahadurShastri National Academy of Administration Mussoorie April 3-5

Ray Asok Kumar & Kamkhenthang H 1991, Land reforms and organizational problems: The Chin-Kukis of

Manipur, seminar on *Organising the Rural Poor for Land Reforms*, NIRD, Hyderabad, March, 14-16

Ray Asok Kumar 1991 Land and Land Reforms: A Study of the Kukis of Manipur Dasgupta Malabika (ed.), *Impact of Land Reforms in North East India*, Omsons Publications New Delhi

Roy Burman BK 1987 Society, Ecology and Land Reforms in Tribal India seminar on *Agrarian Structure, Land Reforms and Agricultural Growth* G.B. Pant Institute

Roy Burman B K 1987 Issues in Land Reforms in N-E Tribal Area *Mainstream*, August 1 and 8

Roy N C & Kuri P K 1998 A Model Institutional Change of Land Ownership in Arunachal Pradesh Behera M C (ed.) *Agricultural Modernisation in Eastern Himalayas* Commonwealth Publishers New Delhi

Chaube S K 1999 *Hill Politics in North East India* Orient Longman Calcutta

Sen Soumen 1987 Land as Property: Its Significance in the Traditional Society and Polity in Khasi and Jaintia Hills; Dutta B B &Karna M N (eds.) *Land Relations in North East India* Peoples Publishing House New Delhi

SharmaBD 1984 Shifting Cultivators and their Development, *Journal for Social Science & Humanities*vol II no 2 April-June

Sukhendu Debbarma 2008 Refugee Rehabilitation and Land Alienation in Tripura FernandesWalter&Barbora Sanjay (ed.)*Land, People and Politics: Contest over Tribal Land in Northeast India*, North Eastern Social Research Centre and International Workgroup for Indigenous Affairs

Taylor J F A 1966 *The Masks of Society* Meredith, New York

Vagholikar N & Das PJ (2010), *Damning the Northeast Northeast-* www.kalpavriksh.org/images/Environment andDevelopment/North EastDams/Damming%20North east %20India

Vasudevan Ramaa 2008, Accumulation by Dispossession in India *Economic and Political Weekly* March 15

Williamson John 2000, What should the World Bank think about the Washington Consensus *World Bank Research Observer* vol 15 no 2

স্মরণ : সুশীল রায়

অপূর্ব

গত ১৮ জুন ২০১৪ নতুন দিল্লীর এইমস হাসপাতালে প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট বিপ্লবী সুশীল রায়। ১৯৩৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর তৎকালীন পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) ঢাকা জেলার সিঙ্গাহর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক সূত্রে তিনি ছিলেন বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের ভাইপো। স্কুলে পড়াকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য স্কুলের অংক শিক্ষক তাঁকে সিপিআই-এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন।

পলিটেকনিক কলেজ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান নিয়ে পাশ করার পর সুশীল রায় ১৯৫৯ সালে টালিগঞ্জের বাঁশদ্রোনীতে উষা কোম্পানীর ফ্যান কারখানায় কর্মজীবন শুরু করেন। এই সময় থেকেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিক ইউনিয়নের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ফলে উষা কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁকে কারখানা থেকে উষার অফিসে বদলি করে। মাস দুয়েক পর অপেক্ষাকৃত 'সুখ'-এর চাকরি ছেড়ে দিয়ে আবার কম মাইনের শ্রমিক হিসাবেই কাজে যোগ দেন।

ইতিমধ্যে উষা কারখানায় মালিকপক্ষের জুলুম চরম মাত্রায় পৌঁছায়। তারা শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে কাজের বোঝা বাড়াতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে কারখানার ১৯৬৩ সালে থেকে উষা কারখানায় দীর্ঘ ছয়মাস ব্যাপী ঐতিহাসিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। সুশীল রায় এতে নেতৃত্বদান করেন এবং পুলিশ ধরপাকড় শুরু করলে তিনি আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হন। পরে অবশ্য মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দাবি মোটামুটি মেনে নেয়।

১৯৬২ সালের ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ এবং সিপিআই-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ডাঙ্গের বিরুদ্ধে উত্থিত অভিযোগকে কেন্দ্র করে সিপিআই-তে বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৬৪ সালে পার্টি বিভাজিত হয়ে সিপিআই(এম) গঠিত হলে, সুশীল রায় সিপিআই(এম)-এ যোগদান করেন। কালক্রমে, আরো অনেকেরই মতো সুশীল রায়েরও মোহভঙ্গ হয়; তাঁরা স্পষ্টই উপলব্ধি করেন যে সিপিএম হলো 'নতুন সিপিআই', যারা আর যাই করুক, বিপ্লবটা করবে না বা সেটা করার উদ্যোগও নেবে না। বরং আরো বেশি করে সংসদীয় ব্যবস্থার পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত হবে।

এই সময়ে, ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি, গোপন সূত্রে তাঁর হাতে আসে 'চিন্তা' নামক একটি রাজনৈতিক দলিল এবং এই 'চিন্তা'র সূত্রেই তাঁর সাথে পরিচয় হয় কানাই চ্যাটার্জি এবং অমূল্য সেন-এর। কানাই চ্যাটার্জি এবং অমূল্য সেন-দের নেতৃত্বাধীন 'চিন্তা' গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে বিপ্লবী কর্মীদের সংহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরবর্তীকালে 'দক্ষিণ দেশ' নামে একটি প্রকাশ্য পত্রিকার মাধ্যমে কলকাতা, বীরভূম, হুগলী, ২৪-পরগণা, বর্ধমান জেলায় তাঁদের কর্মকাণ্ড বিস্তার করেন। নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের পর 'দক্ষিণ দেশ' গোষ্ঠীর কর্মীরা সিপিএম ত্যাগ করেন কিন্তু তাঁরা AICCCR বা পরবর্তীকালে CPI(ML) পার্টিতে যোগদান না করে ১৯৬৯ সালে ২০ অক্টোবর মাওবাদী কমিউনিস্ট কেন্দ্র (এমসিসি) গঠন করেন।

সুশীল রায় ছিলেন এমসিসি-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। উষা কারখানার চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে জীবন শুরু করেন। এমসিসি-র পেশাদার বিপ্লবী কর্মী হিসাবে তিনি বিহারের গ্রামে কাজ শুরু করেন। ইতিপূর্বে বীরভূম জেলার বিহার সীমান্তবর্তী আদিবাসী গ্রামগুলিতেও তিনি কিছুকাল কাজ করেন।

সত্তর দশকের শেষার্ধ থেকেই এমসিসি, সিপিআই (এম-এল)-এর বিভিন্ন গ্রুপের সাথে ঐক্য আলোচনার প্রয়াস চালাতে থাকে। এই ঐক্য প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে বাঙ্গালোরে সিপিআই(এমএল) পিপলস ওয়ার গোষ্ঠীর সাথে এমসিসি-র তরফে কানাই চ্যাটার্জি এবং সুশীল রায় আলোচনায় বসেন।

ঐক্য আলোচনা পর্বেই প্রয়াত হন এমসিসি-র দুই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অমূল্য সেন এবং কানাই চ্যাটার্জি। ১৯৮২-র আগস্টে এমসিসি-র নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় এবং সুশীল রায় কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

চীন সম্বন্ধে ভারতে নানান 'অন্যরকম' খবর আসতে শুরু করে। বিপ্লবী বামপন্থী শিবিরের অনেকেই বুঝতে পারেন যে 'চেয়ারম্যানের চীন' আস্তে আস্তে সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদের দিকে পিছু হাঁটা শুরু করেছে। চীন কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে সুশীল রায় ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এমসিসি-র তরফে চীনে যান। চীন থেকে ফিরে এসে, সুশীল রায় কেন্দ্রীয় কমিটিতে চীনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেন এবং তারপরেই এমসিসি সিদ্ধান্ত নেয়, ''চীনা পার্টিতে (আর) সর্বহারার নেতৃত্ব নেই''। এমসিসি চীনা পার্টির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে।

১৯৯৫ সালে সুশীল রায়ের একটি চোখ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি এমসিসি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি নেন।

২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জনযুদ্ধ, এমসিসি ও অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠন একত্রিত হয়ে সিপিআই

এর পর ৩৬ পৃষ্ঠায়

স্মরণ

সুকুমারী ভট্টাচার্য— এক মনীষা-দীপ্ত নারী

গার্গী

তিরানব্বই বছর বয়সে সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রয়াত হলেন। একটা দীর্ঘ জীবন তিনি কাটিয়েছেন, এবং জ্ঞান সমুদ্রের যতখানি আকর আয়ত্ত করা যায় তা করেই তিনি সমস্ত জীবনটা অতিবাহিত করেছেন। তাঁকে নিয়ে নানা লেখার একটিতে পড়ছিলাম তাঁর আফশোসের কথা— ‘‘কটা বই-ই বা জীবনে পড়ে নিতে পেরেছি? কত যে বাকি রয়ে গেল—। তাঁর মতো বিদগ্ধ পণ্ডিতের উপযুক্ত আফশোস। জ্ঞান সমুদ্রে যারা ডুব দিয়েছেন তাদের কারো জন্যই বোধহয় একটা জীবন যথেষ্ট নয়— জ্ঞানসমুদ্র থেকে মুক্ত তুলে আনার জন্য। তবে শুধু জ্ঞানই নয় সুকুমারী ভট্টাচার্য আমাদের শিক্ষিকা হয়ে উঠেছেন অন্য কারণে। তিনি প্রাচীন ভারত নিয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান নিয়ে তাঁর গোটা জীবনই প্রাচীন ভারত থেকে আধুনিক ভারতীয় সমাজের আনাচে কানাচে ঘুরেছেন, বিশেষজ্ঞের মত দিয়েছেন। তিনি যেমন প্রাচীন ভারতকে জিজ্ঞাসু ছাত্রীর মতো প্রশ্ন করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, একই ভাবে আধুনিক ভারত ধর্মীয় গোঁড়ামির নামে যে বর্বরতা বারে বারে প্রত্যক্ষ করেছে, তাঁর কথায় যা সমাজে অমঙ্গলের সূচনা, আদশহীন আচরণ ও অবস্থান— তাকেও বিঁধতে পিছপা হননি। প্রাচীন ভারতকে জানতে-বুঝতে, সেই ভারতের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, শূদ্রের অবস্থান, নারীর অবস্থান জানতে, বর্তমান ভারতের ওপর সেই প্রাচীন ভারতের প্রভাব বুঝতে আমরা তাই বারবার দ্বারস্থ হই সুকুমারী ভট্টাচার্যের।

পাঠক হিসেবে যখন তাঁর লেখায় মগ্ন হই— অনুভবের চেষ্টা করি তার গভীরতা। ইতিহাসের পরতে জড়িয়ে থাকা সময়কে কত সাবলীলভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। শুধু পাঠের মধ্য দিয়ে একজন মানুষকে কত গভীরে অনুভব করা যায় তা সুকুমারী ভট্টাচার্যকে পড়তে গিয়ে আবারো মনে হলো। রবীন্দ্রনাথ-কে দেখিনি। তবু তাঁর বিপুল সৃষ্টিসম্ভার তাঁকে চিনে নিতে সাহায্য করে। কিন্তু সুকুমারী ভট্টাচার্য তো নাগালের মধ্যেই ছিলেন। তবু তাঁকে কাছ থেকে চিনবার অবসর ঘটল না— এ আফশোস রয়েই যাবে। ওঁকে নিয়ে লিখতে বসে ওনার অজস্র বিশ্লেষণী রচনাকেই অবলম্বন করছি।

প্রাচীন ভারত ওঁর লেখার একটা বিশেষ জগৎ। প্রাচীন ভারত নিয়ে নানা প্রচলিত ‘মিথ’ উনি নানা দিক দিয়ে ভাঙতে চেষ্টা করেছেন। এবং ভেঙেছেন। মিথগুলি এই যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ছিল আদর্শ সমাজ, সেই সমাজ আদর্শ নারী তৈরি করেছিল। আর নানা কৌশলে এই আদর্শ সমাজের ধ্যানধারণা বা ‘রামরাজ্য’-কে বিশ্বাসের ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত করেছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা। তাদের উত্তরসুরীরা যে খ্রিস্টান পরিবারের কন্যা হওয়ার কারণে সুকুমারী ভট্টাচার্যকে সংস্কৃত পড়তে দেননি এ তথ্য তাই বিস্ময় তৈরি করে না। ওদের ভাবনায় সংস্কৃত কেবল ‘আদি হিন্দুদের ভাষা’ আর উনি তো খ্রিস্টান! সংস্কৃতের শুদ্ধতা থাকে কী করে! কিন্তু সুকুমারী দমবার পাত্রী নন, ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. করলেও প্রাইভেটে সংস্কৃতে এম.এ. করেন আর প্রাচীন পুঁথি তথা শাস্ত্র-কাব্য-পুরাণের আনাচে কানাচে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন। শুধু তাই নয়, প্রাচীন ভারতের একমাত্রিক ধারণাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, এবং প্রখর বিশ্লেষণী যুক্তিতে বিরুদ্ধ মত প্রতিষ্ঠা করলেন। শুধু প্রাচীন ভারত নিয়েই ওঁর এত অনুপুঙ্খ চর্চা আছে যা একটা লেখায় বলে ফেলা যায় না। শুধু নারী বিষয়ে তাঁর গবেষণা এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। বলতে গিয়ে অনুভব করি, তাঁর লেখায় ভারতে প্রাচীন থেকে আধুনিক সময়পর্বে নারীর রূপ নির্মিত হয়েছে তা যেন এক বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছে— পরিবারের নারী থেকে গণিকা নারী— সমাজে নারীর অবস্থানের এক জীবন্ত দলিল এগুলি।

প্রথম সাহিত্য ঋগ্বেদ দেখিয়ে দেয়, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ মোটেও নির্ভেজাল আদর্শবাদে মোড়া ছিল না। মহানুভবতার পাশাপাশি শঠতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতার সহাবস্থান ছিল। সমাজে অপরাধপ্রবণতা ও দুর্নীতিরও প্রমাণ পাওয়া যায়, তা তিনি দেখিয়েছেন। এই সমাজেই বহুপত্নীকতা স্বাভাবিক বিষয় ছিল এবং বহু সূক্তেই সতীনকে মেরে ফেলার প্রয়াস আছে। তিনি ‘গণিকা’-র বহু প্রতিশব্দকে প্রামাণ্য হিসেবে ধরেছেন, যা থেকে বোঝা যায় ঋকবেদের সমাজে গণিকাবৃত্তিও ছিল। তবে মূল্যের বিনিময়ে নারীর দেহদানের শুরুর ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ জানা না গেলেও— তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন— অর্থাৎ ‘সমাজে বিবাহ ও পরিবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে নারী যখন স্বাতন্ত্র্য হারায় তখন থেকেই এর শুরু’— আমাদের ভাবনার একটা পরিসর তৈরি করে দেয়। নারীর মর্যাদা কেমন ছিল? যজুর্বেদ উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন— গৃহশ্রম আর স্বামী-সন্তান-পরিজনদের সেবা নারীর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। বিরুদ্ধ যুক্তিতে বিভিন্ন সময়ে বলা হয়ে থাকে যে মধ্য যুগ, বা মুসলমানদের আগমনের পর থেকেই নারীর অবনমন শুরু হয়, তার আগে নয়। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকেই যে নারীর মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে— তার বহু তথ্য প্রমাণ তিনি হাজির করেছেন। সূত্র সাহিত্য থেকে তিনি দেখিয়েছেন, নারীর জীবদ্দশায় বিভিন্ন পর্বে পিতা-স্বামী-পুত্র রক্ষাকর্তা— নারীর কোনো স্বাধীনতা ছিল না (ন স্ত্রী স্বতন্ত্রমহর্তি)— পরাধীন

মানুষের কোনো মর্যাদা কি থাকতে পারে— পরিবারে কিংবা সমাজে? নারীর মর্যাদা বিষয়ে সযত্নলালিত মিথটি নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখতে তিনি সাহায্য করেন।

মর্যাদাপূর্ণ স্বাধীন নারীর ভাবমূর্তি নির্মাণ করতে গিয়ে যে প্রশ্নটি সামনে চলে আসে তা হলো অর্থনৈতিক দিক থেকে কি নারী স্বাধীন ছিল? তিনি দেখিয়েছেন, বৈদিক সাহিত্য, বিশেষ করে ঋগ্বেদ সংহিতা সে সময়ে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে নীরব। নারীর গৃহশ্রম অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করা নিয়ে আজকের সময়ে বিতর্ক থাকলেও বিষয়টা যে চিরকালীন তাও সুকুমারী দেখিয়েছেন, একই সাথে পাঠককে সচেতনও করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন— "বহু অনুসন্ধানেও নারীকে সেকালের সমাজে সম্মানের আসনে দেখতে পাইনি। অশিক্ষার অন্ধকারে নির্বাসিত, স্বাধীন অর্থকারী বৃত্তি থেকে বঞ্চিত নারী"। তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী) উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন— নারীর শিক্ষা নেই তাই তার অর্থকরী বৃত্তিও নেই ('স্ত্রিয়ো নিরিন্দ্রিয়া অদায়াদী')। তদুপরি স্ত্রীধন বলে যা কিছু নারীর নিজস্ব থাকত তা রক্ষা করা বা ভোগ করা দুরতিক্রম্যই ছিল। কাজেই প্রাচীন ভারত নারীর সম্মান মর্যাদা রক্ষা করেছে, এ বিশ্বাসের মূলে আঘাত আসা স্বাভাবিক। বরং বলতে হয় পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক পারিবারিক কাঠামোয় আজ যেখানে নারী দাঁড়িয়ে আছে দুই সহস্রাধিক বছর আগেও সেই অবস্থাই আমরা দেখতে পাই। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "কল্পনার আড়ালে যে সব বাস্তব নারী ছিল সে সব মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। নারীর প্রেম, নারীর যে কোনো ভূমিকাই পুরুষ পরিকল্পিত, পূর্ব নিরূপিত একটি ছকমাত্র'। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে এই ছকটাকে আমরা অবশ্যই চিনে নিতে পারি।

আদ্যন্ত হিন্দুত্ববাদের মোড়কে গঠিত একটি রাজনৈতিক দল আজ ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধার। হিন্দুত্ববাদ কতগুলো ধারণাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করে। যেমন 'সতীত্ব', 'পাতিব্রত্য','আদর্শ নারী' ইত্যাদি। প্রাচীন মহাকাব্য পুরাণ ইত্যাদি থেকে দৃষ্টান্ত তুলে প্রমাণের চেষ্টা করে ঔচিত্য অনৌচিত্যের আপেক্ষিক ধারণাটি। অদূর ভবিষ্যতেই আমরা যে এমন প্রয়াস দেখব (বা দেখছি) তা এখনই বলে দেওয়া যায়। তাই প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য যে নির্মোহ এবং বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে রামায়ন, মহাভারতকে ব্যাখ্যা করেছেন তা পড়ে দেখা আজ খুব প্রয়োজনীয়। প্রসঙ্গত বলতে হয়, বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার পর রামভক্তদের রাম-কে তলিয়ে দেখবার বাসনায় তিনি আবারো রামায়ণ খুঁটিয়ে পড়েন। তাঁর কথায়— "আগাগোড়া খুঁটিয়ে পড়লাম রামায়ণ। সেখানে যে রামকে পেলাম তিনি বন গমন পর্যন্ত আদর্শ পুরুষ হলেও তার পরে তাঁর মধ্যে এমন কিছুই পাওয়া গেল না যাতে তাঁকে 'মর্যাদা পুরুষোত্তম' বলা যায়।" এই সেই রাম যিনি রাজা দশরথের কাছ থেকে ভরতের অভিষেকের খবর না পেয়ে অন্তর্দাহে পুড়েছেন, তিনি জানাচ্ছেন পিতা বললে তিনি খুশি হয়েই, ভরতের জন্য সীতা, রাজ্য এমনকি প্রাণও দিতে পারতেন। প্রাবন্ধিক এরপর যথার্থই দেখিয়েছেন, সীতা এখানে ব্যক্তি নয়, বস্তু মাত্র। সমাজ যে ওই চোখেই নারীকে দেখত। রামের কাছে ভ্রাতৃস্নেহের তুলনায় পত্নীপ্রেম নিতান্তই তুচ্ছ ছিল। তাঁর বোধে স্ত্রী সুলভ, কিন্তু ভ্রাতা দুর্লভ। স্ত্রীকে তাই অনায়াসেই ত্যাগ করা যায়। লক্ষ্মণের প্রতি প্রীতি আর সীতার প্রতি প্রেমের প্রতিতুলনায় লক্ষ্মণ পুরুষ বলেই তার স্থান উপরে— এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তিনি সমাজে পুরুষের চিরকালীন আধিপত্যের স্থানটিকে চিহ্নিত করেছেন।

অন্য দিকে রামের প্রতি সীতার প্রেম অকুণ্ঠ। তিনি স্বেচ্ছায় বনগমন করেছিলেন প্রিয়দর্শন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চান না বলে। পতি বিরহ তাঁর কাছে অসহনীয় হবে বলেই তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন— রামায়ণের মূল কাহিনী এমনটাই বলছে। সুকুমারী ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, পরবর্তীকালে সীতার বনগমনকে পতিব্রতার ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ইহলোক-পরলোকে পতিই নারীর একমাত্র গতি'। হিন্দুত্ববাদের সহায় এই ব্যাখ্যা। ভারতীয় সতীত্বের' মডেল হিসেবে তাই সীতাকে তুলে ধরা শুধু হিন্দুত্ববাদ নয়, এইভাবে পুরুষের চোখে আদর্শ নারীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরা তথা পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জোরের সাথে প্রতিষ্ঠা করারও এক প্রচেষ্টা। প্রখর পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধে জারিত পরবর্তীকালের রামায়ণ দেখিয়েছে, সীতা রামকে বলছেন নারীর একটি গতি স্বামী, দ্বিতীয় পুত্র, তৃতীয় আত্মীয়রা, চতুর্থ কোনো গতি তার নেই। রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ নিয়ে গোঁড়া বর্ণহিন্দুদের এই সুপরিকল্পিত কৌশলকে প্রশ্ন করার অবসর তৈরি করে দিয়েছেন প্রাবন্ধিক সুকুমারী।

বনবাস জীবনে সীতা রাবণের কুদৃষ্টিতে পড়লে এবং সেকারণে তাকে অশোকবনে বন্দিনী থাকতে হলে সেটা তার অপরাধ হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে। বীরশ্রেষ্ঠ রাম সীতা উদ্ধার করেছেন সীতার জন্য নয়, বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য। এমন কি তিনি 'পরহস্তগতা' সীতার এক মুহূর্তের হস্তধারণও করতে পারেন না, কারণ সে নারী 'কুকুরে চাটা ঘি'— যাকে 'ভোগ' করা যায় না। সুকুমারী ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, ধর্মসূত্রে আছে ধর্ষিতা নারীকেও পরের মাস থেকে স্বামী শুচি জ্ঞান করবেন। রামায়ণ রচনা কয়েকটি ধর্মসূত্রের সমসাময়িক। তাই শাস্ত্রজ্ঞ রাম কীভাবে অনায়াসে সীতাকে 'ত্যাগ' করলেন? এমনকি সীতা রাবণ কর্তৃক ধর্ষিতা কিনা তা জানার প্রয়োজনটুকুও রামের দিক থেকে ছিল না। এখানে সীতার যুক্তি ভাবার মত— "আমার নিজের যে মন তা তো তোমাতেই আছে, আমার যে শরীরটা পরাধীন সেটার সম্বন্ধে অক্ষম আমি কী করব?" আজকের আধুনিক যুগেও লাভপুরের গণধর্ষিতা মেয়েকে বন্ধ

ঘরে থাকতে হয়। মেয়েদের শরীরের শুচিতা নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বারবার প্রশ্ন তুলেছে— মেয়েদের অপদস্থ করেছে, শরীরের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য নানা নিদান দিয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজও যে এর থেকে অন্য রকম ছিল না, সে সমাজেও নারীর মর্যাদা যে দৈহিক শুচিতা কেন্দ্রিক, মনের স্থান যে নগণ্য, সে সম্পর্কে রামায়ণে সীতার তথা নারীর স্থান বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক আমাদের সচেতন করেছেন।

কোনো সমাজেই পুরুষের শারীরিক শুচিতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন কখনও উত্থাপিত হয়নি।

নারী সমাজের উপর হিংসাত্মক উপদ্রব— প্রাচীন ভারতের নানা শ্লোক থেকে উদ্ধার করা এই অংশে তিনি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন সেই সময়েও নারীদের উপর পুরুষতন্ত্রের হিংসা কিছু কম ছিল না। প্রাচীন ভারত মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করেনি বরং মেয়েরাই ছিল অন্যের সম্পত্তি। বেদ উদ্ধার করে তিনি দেখিয়েছেন— নারীর শরীর তার নিজস্ব নয় বরং নিঃশর্তে পতির কাছে আত্মসমর্পণ করাই ছিল দস্তুর। মৈত্রায়নী সংহিতায় বলা হয়েছে— নারী শরীর নারীর নিজের নয়, তাই যৌন নিপীড়ন থেকে তার নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ নেই। 'বৈবাহিক ধর্ষণ' শব্দটার সাথে আধুনিক সমাজ অনেক বেশি পরিচিত হলেও ধর্ষণ করে বিয়ে অথবা বিয়ের পরে ধর্ষণ কোনোটাই অবিদিত ছিল না প্রাচীন ভারতেও। এখান থেকেই প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্ত টেনেছেন— "হয় সমাজ বুঝেছিল মেয়েদের মন বলে কিছু নেই, নয়তো বা তা ছিল পুরুষের উদ্ধত নিয়ন্ত্রণে; পুরুষ সচেতনভাবে নারীবিদ্বেষী ও ধর্ষকাম।"

শুধু শারীরিক নির্যাতন নয়, মানসিক নির্যাতনও ছিল। বেদ গ্রন্থগুলি প্রায়শ দেখিয়েছে— "নারী শুধু অধম জীব তাই নয়, অকল্যাণকরও বটে"। প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয় যে নারী ও শূদ্রকে অশুভ ও অসত্য-র মূর্তি বলে যে সময়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। কঠোর বাক্য ব্যবহার করলে সেই নারীকে পরিত্যাগ করার কথাও বলা হয়েছে। আধুনিক সমাজে স্বাধীনতা-সচেতন নারীর নিজের অধিকারের প্রশ্নে কোনো স্পষ্ট ঘোষণা আজও খুব একটা নিতে পারে না সমাজ। সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দুটি অসবর্ণ নারী-পুরুষের সম্পর্ক বা বিয়ে যেভাবে খাপ পঞ্চায়েতের মাতব্বরদের হাতে নিষ্পেষিত হয় বা পুরুষের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে যেভাবে মেয়েদের ধর্ষিত হতে হয় তা বুঝিয়ে দেয় এই সমাজ কোন্ উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। সুকুমারী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধগুলি এই যোগসূত্রটা খুঁজে নিতে সাহায্য করে।

প্রাচীন ভারত নিয়ে তিনি দীর্ঘ কাজ করেছেন। তার সেই সব লেখার মূল্য এককথায় বোধ হয় বলা সম্ভব নয় আর মূল্য বিচারের ধৃষ্ঠতাও আমার নেই। শুধু প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়, কী অমূল্য সম্পদ তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তাঁর প্রতিটি লেখায় ইতিহাসের সেই সময়কালের দ্বার উন্মোচিত হয়। সে সময়কালে নারীর গৌরবোজ্জ্বল অবস্থান নিয়ে একটা অসত্য কথন প্রচলন ছিল এবং আছেও। সেই প্রচলিত মিথ ভেঙে তিনি কঠোর সত্যকে সামনে আনেন। যিনি ধর্মসূত্র রচনার সময় কালে তৈরি হওয়া রামায়ণ মহাভারত থেকে নানা শ্লোক উদ্ধার করে (প্রক্ষিপ্ত অংশ সহ) দেখিয়েছেন— সেই সমাজে নারীর অবস্থান কেমন ছিল। সেই যুগেও যে মেয়েদের উপর যৌন হেনস্থা পুরুষদের কোনো কাজের প্রতিশোধ হিসেবে সংঘটিত হত যা আজকের সময় থেকে একটুও ভিন্ন চরিত্রের নয়, তা বিচার করে দেখার অবকাশ তৈরি করেন তিনি। একই সাথে তিনি এটাও দেখান যে কোনো "কার্যকর প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই" ঐসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যেত, এবং "আজকের দিনেও — এই প্রতিবাদ সমান জরুরি"। এখানেই তাঁর অনন্যতা। প্রাচীন ভারত থেকে আধুনিক ভারত— মেয়েদের হীন অবস্থায় এক চলমান ইতিহাসকে তিনি পাঠকের দরবারে হাজির করেছেন। পাঠক হিসেবে এর গৌরব আমরা দাবি করতেই পারি। প্রাচীন ভারতে ধর্ম থেকে আজকের সময়ে ধর্ম বা ধর্মের নামে মৌলবাদীদের সাম্প্রদায়িকতা নামক অপকর্ম— প্রতিটি বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণী লেখা যেন এক একটি উজ্জ্বল প্রতিবাদ। সমাজ-সভ্যতায় সম্পৃক্ত প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই যে সমাজকে আলো দেখাতে পারে তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। জাতপাতের উর্ধ্বে, ধর্মীয় মৌলবাদের উর্ধ্বে, নারীপুরুষের সমতার ভিত্তিতে আমরা যারা আদর্শ সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখি তারা তাই ওনার লেখায় অনুপ্রাণিত হই। ওঁর মনীষাদীপ্ত প্রতিটি লেখাই আমাদের চলার পক্ষে আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

স্মরণ : সুশীল রায়

৩৩ পৃষ্ঠার পর

(মাওবাদী) পার্টি গঠিত হওয়ার পর সুশীল রায় মাওবাদী পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য নির্বাচিত হন।

২০০৫ সালের ২১ মে হুগলীর কোন্নগর অঞ্চল থেকে সুশীল রায় গ্রেপ্তার হন। প্রায় আট বছর তীব্র রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি থাকেন। জেলবন্দি অবস্থায় তাঁর ক্যান্সার রোগ ধরা পড়লেও জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে কার্যত বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখে এবং শেষ পর্যন্ত প্রগতিশীল নাগরিক সমাজ এবং অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের চাপে পুলিশ তাঁকে দিল্লীর এইমস হাসপাতালে ভর্তি করে এবং জামিনে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এইমস হাসপাতালেই ৭৮ বছর বয়সে সুশীল রায় প্রয়াত হন।

আজীবন সংগ্রামী, মুক্তিকামী এই মানুষটির মৃতদেহ তাঁর ইচ্ছানুসারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার স্বার্থে হাসপাতালে দান করা হয়।

স্মরণ

একটি মানুষের মতো মানুষের কাহিনী—বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

বিশুদ্ধা বা অনেকের বিশুদ্ধদা প্রয়াত হলেন ৩১ মে, ২০১৪। বৌদ্ধিক সমাজে অপরিচিত, গ্রামের মানুষ বিশুদ্ধা অন্তরালে থাকতেই পছন্দ করতেন। এমন এক অন্তরালবাসী মানুষ এই নষ্ট সময়ের বিধ্বস্ত পরিসরে ঋজু জীবনযাপনের এক উদাহরণ। টাল-মাটাল সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব। মানুষের মৃত্যুর পর যে সমষ্টিগত বৃহৎ মানব নিরবচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়ে চলে, তার সামনের সারিতে হয়ত এখনও দণ্ডায়মান আমাদের বিশুদ্ধা!

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক প্রত্যন্ত প্রান্তে মন্দিরবাজার পেরিয়ে অকৃতদার বিশুদ্ধা থাকতেন তাঁর বৃদ্ধা মা-র সঙ্গে একটি দোতলা মাটির বাড়িতে। তাঁর সঙ্গী ছিলো একরাশ বই আর ছোটো ছোটো পত্র-পত্রিকা। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ডাক বিভাগের কর্মী, যেখানে তিনি একদিনও দেরি করে ঢোকেননি বা আগে বেরিয়ে যান নি। কিন্তু শুধু যদি এই পরিচয় নিয়ে বিশুদ্ধা চিহ্নিত হতেন, তবে মিছিলের ভিড়ে তাঁকে নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু থাকতো না।

আশির দশকে নয়া শিল্পায়নের রাস্তা বেয়ে উন্নয়নেই মুক্তি, এমন ধারণা নিয়ে রাজ্যের গ্রামে-গঞ্জে জমি-গ্রাসের প্রাথমিক প্রচেষ্টা তখন শুরু হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বাংলার পশ্চাৎগামিতার কারণ হিসাবে নেতৃবৃন্দ চিহ্নিত করেছেন কৃষকদের পশ্চাৎপদ মানসিকতা, আধুনিক কৃষি প্রকরণের অভাব (প্রধানত রাসায়নিক কীটনাশক, রাসায়নিক সার)। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মন্দিরবাজার ছাড়িয়ে কৃষি জমির ওপর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য এক উদ্যোগপতির সুন্দরবন ফার্টিলাইজার সংস্থা নামের একটি ডবল-সুপার-ফসফেট রাসায়নিক সার কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব এলো। আমরা তখন বিজ্ঞানকর্মীদের একটি সংস্থার মুখপত্র-র সঙ্গে যুক্ত। আধা-তাত্ত্বিক, আধা-অভিজ্ঞতা প্রসূত খুবই প্রাথমিক চিন্তা সম্মিলিত একটি লেখা প্রকাশিত হলো সেই বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার ত্রৈমাসিক মুখপত্রে—সুপার ফসফেট রাসায়নিক সারের পরিবেশগত বিপদকে চিহ্নিত করে।

এক বিকেলে ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত-এর আবির্ভাব ঘটলো সংস্থার দপ্তরে— হাতে পত্রিকার কপিটি। স্বাভাবিক বিনয়ী, নম্র এবং আপাদমস্তক ভদ্র বিশুদ্ধা নমস্কার করে সসংকোচে পরিচয় জ্ঞাপনের পর সুপার ফসফেট কারখানার দূষণ নিয়ে অনেক অজানা তথ্য দেওয়ার পর স্থানীয় স্তরের সমস্যা, আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এবং স্থানীয় দাবিদাওয়া নিয়ে মৃদুভাষায় আন্তরিক কথনভঙ্গিতে বিষয়টি সম্পর্কে পত্রিকার কর্মীদের অবহিত করলেন। বিশুদ্ধা-র সঙ্গে পথ চলার সেই শুরু।

স্থানীয় অঞ্চলের বিশ থেকে যাট বছরের প্রায় প্রত্যেকর সঙ্গে বিশুদ্ধার একেবারে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো। কার কখন কী প্রয়োজন, সেই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আপৎকালীন নানা প্রয়োজন মেটানোর পরিকাঠামো তিনি স্থানীয়ভাবেই নির্মাণ করেছিলেন।

প্রশাসনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, স্থানীয় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সক্রিয় উদ্যোগ, সন্ত্রাস, হুমকি এ সমস্ত উপেক্ষা করে, প্রায় তাঁর একক প্রচেষ্টাতেই বলা যায়, সুন্দরবন ফার্টিলাইজার সংস্থা স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। মনে রাখা দরকার যে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রভাব খাটিয়ে জমির দর দশ-পনেরো গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু বিশুদ্ধা এবং তাঁর কর্মীবাহিনীর যুক্তির কাছে ক্ষমতা পরাস্ত হয়। সুন্দরবন ফার্টিলাইজার সংস্থা পাততাড়ি গুটিয়ে জলপাইগুড়িতে পাড়ি জমায়। সেখানকার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও একাধিকবার কলকাতায় এসে বিশুদ্ধা এবং তাঁর সাথীদের পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

হোপ-৮৬ এবং অপসংস্কৃতির বেনোজল গ্রাম-গঞ্জ দখল করে মোটামুটি আশির দশকের শেষে— বিশুদ্ধার এলাকাতেও সেই ঝড়ের ঝাপটা আছড়ে পড়ে। বিশুদ্ধা মাতেন স্থানীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে। গানের দল, রায়বেঁশে নাচ, কবিগান ইত্যাদির মাধ্যমে যে ব্যতিক্রমী বিকল্প তিনি নির্মাণ করেন, তাতে আকৃষ্ট হয়ে নতুন প্রজন্ম এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাৎসরিক অনুষ্ঠান, পরবে অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে এই সব সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পল্লীর গভীরে শেকড় গাড়তে সক্ষম হয়।

বিশুদ্ধা-র সাংগঠনিক দক্ষতা ছিলো প্রশ্নাতীত। সার কারখানার বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটি পর্যায়ে তাঁর আহূত একটি সভায় লোকসংখ্যা প্রায় তিন হাজার ছাপিয়ে গিয়েছিল। মনে রাখতে হবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ঐ অঞ্চল দুর্গম এবং কষ্টকরভাবে যাতায়াতের জন্য বিখ্যাত।

পশ্চিমবঙ্গের গণবিজ্ঞান আন্দোলন যখন ভ্রূণ আকারে, তারও আগে থেকে বিশুদ্ধা স্থানীয় অঞ্চলে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে প্রচার, প্রসার এবং হাতে-কলমে অনুশীলনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। পরপর দুটি সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময় ঐ অঞ্চলে তাঁর ভূমিকা ছিলো আক্ষরিক অর্থেই অনন্য। বস্তুত '৯০ দশকের শেষে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ নিয়ে তিনি যে টেক্‌নিক্যাল প্রবন্ধ লেখেন বাংলায়, তা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার এক অনন্য উদাহরণ। শ্রী অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই

গ্রহণের পর ঐ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর তুল্যমূল্য বিচার করে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে বাংলা ভাষায় তখন পর্যন্ত এই বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকায় বিশুদ্ধার প্রকাশিত প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণে এবং সঠিকতার মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ।

কলকাতা থেকে তখন গণ আন্দোলনের জাতীয় সমন্বয় বা সংক্ষেপে এনএপিএম-এর মাসিক ইংরাজি মুখপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। সময়টা ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি। পত্রিকাটি পঞ্জীকৃত নয়, অতএব ডাক-বিভাগ থেকে যে ছাড় পাওয়া যায় পত্রিকা তার থেকে বঞ্চিত। বুকপোস্ট-এ পাঠাতে হয়। কোনও পোস্ট অফিস একসঙ্গে পাঁচ-সাতটার বেশি পত্রিকা বুক পোস্ট-এর জন্য গ্রহণ করে না। অথচ পোস্ট করতে হবে ৩৫০টি পত্রিকা। প্রায় ৪০টি পোস্ট অফিস ঘুরে সাতদিনে ঐ পত্রিকাটি ডাকে দিতে হচ্ছে। বিষয়টি জানতে পেরে বিশুদ্ধা একদিন যোগাযোগ করলেন— তিনি তখন বালিগঞ্জ পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার, স্থানটি বিড়লা মন্দিরের বিপরীতে।

৩৫০টি পত্রিকার মোড়ক নিয়ে আমরা দুজন বিকেল তিনটে নাগাদ বিশুদ্ধার দপ্তরে হাজির হলাম। বিশুদ্ধা বয়স নির্বিশেষে ছেলেদের দাদা এবং মহিলাদের দিদি বলতেন। আমাদের বসিয়ে তিনি নিজেই স্ট্যাম্প সেঁটে বিভিন্ন রাজ্যের মোড়কগুলি রাজধানী এবং অন্যান্য শহরের জন্য পৃথক করে পাঠানোর বন্দোবস্ত করলেন। একদিন বা একবারের কথা নয়, সুদীর্ঘ ১৭ মাস তিনি এই গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা দেখেছি বিকেল চারটে বাজতেই তাঁর সহকর্মীরা দিনের বাকি কাজগুলি নিশ্চিন্তে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে কেউ পার্ক সার্কাস, কেউ শ্যামবাজারে তাঁদের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিয়েছেন। বিশুদ্ধা নিজের এবং তাঁদের সমস্ত কাজ শেষ করে, হাসিমুখে বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে আমাদের সঙ্গে রওয়ানা দিলেন, সুদূর ২৪ পরগণার ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে। সঙ্গে ছোটো একটি মুড়ির ঠোঙা আর রাস্তায় কেনা একটি বেগুনি। পরে শুনেছি, এই পত্রিকা নিখুঁত এবং সঠিক সময়ে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে তিনি নিজেই কখনও কখনও তাঁর পরিচিত নানান পোস্ট অফিসে মোড়কগুলি ঘাড়ে করে ঘুরেছেন।

'আকাশ ভরা সূর্য তারা' গানটি পরিবেশ সঙ্গীত হওয়ার কথা শুনে বিশুদ্ধার সেই আবেগ-মথিত কথোপকথোন ভোলবার নয়। পরবর্তী কালে এই বিষয়ে এবং বসুন্ধরা সম্মেলনে নিয়ে তাঁর লেখা সব মহলেই উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে।

অবসর গ্রহণের পর তার কলকাতা আসা অনিয়মিত হওয়ায় দেখা-সাক্ষাৎ কমে আসে। কিন্তু তাঁর সক্রিয় জীবনযাপনের খবর নানাভাবে এসে পৌঁছত। গ্রামীণ সারল্য এবং প্রগাঢ় প্রজ্ঞার রসায়নে তাঁর যে পরিশীলিত যুক্তিবাদী মননটি নির্মিত হয়েছিলো তা নিয়োজিত হয়েছিলো স্থানীয় অঞ্চলের বৌদ্ধিক মান উন্নয়নের এক দুঃসাধ্য প্রয়াসে। কি অনায়াসেই তিনি স্থানীয় কৃষক থেকে স্থানীয় বিধায়ক— সবার সঙ্গে মিশে গিয়ে কাজ করতে পারতেন। বিজ্ঞান মেলা থেকে সংস্কৃতি মেলা, রায়বেঁশে থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর এই অনায়াস বিচরণ স্থানীয় তরুণ এবং যুবকদের আদর্শস্থানীয় হয়ে ওঠে। কত স্থানীয় কবি, লোকগানের দল বা গায়ক তাঁর সংস্পর্শে এসে জনপ্রিয় হয়েছেন, তার খবর কেবল তাঁরাই রাখেন।

বিশুদ্ধা-র স্বাভাবিক বিনয় কেউ কেউ তাঁর 'গ্রামীণ হীনমন্যতার' প্রকাশ বলে ভাবতেন। আমার কিন্তু মনে পড়তো ছেলেবেলার পড়া কবিতার লাইন— *নুয়ে পড়ে ফলভরে পাদপ নিচয় / জলদ জলের ভারে কত নত হয়*। যে অসূয়ামুক্ত অগাধ প্রাণশক্তির বিশুদ্ধতায় তাঁর দীর্ঘ অর্থবহ জীবনযাপন, সেই বিরাট হৃদয়ের মানুষটি আমাদের ভাবাবেন বহুদিন।

মোদির বাজেট

৬ পৃষ্ঠার পর

করিয়ে নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছে মোদি সরকার। এর সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিরও একটা সম্পর্ক আছে।

তাহলে এরকমই কি দাঁড়াচ্ছে যে মোদি-সরকার আর একটা ইউপিএ সরকার হতে চলেছে? মোটেও তা নয়। দাঁত-নখ সবই আছে এই সরকারের, তবে 'সাইনিং ইন্ডিয়া'র আতঙ্কও আছে এই সরকারের— আতঙ্ক কাটলেই এগুলো সবই যে বেরিয়ে পড়বে, 'এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট কমিশন' গড়ার মধ্য দিয়ে তার ইঙ্গিত আছে।

দাঁত-নখ বের করার জন্য মার্কিন ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজার-নির্ভর আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে তাকিয়ে থেকে যে লাভ নেই, মোদি সেটা বুঝেছেন সম্ভবত ক্ষমতায় আসার আগেই। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে মোদি চাইছেন মার্কিন সহ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নির্ভর বাজারের বদলে আঞ্চলিক বাজারগুলিতে পা রাখতে। *সার্ক*-ভুক্ত দেশগুলি দিয়ে তিনি এটা শুরু করেছেন শপথ গ্রহণের দিন থেকেই। এবার তিনি ধরছেন *ব্রিকস*-এর বাজার। এগুলির আর্থিক পরিস্থিতি ইউরোপ-আমেরিকার চেয়ে ভালো এবং কিছুটা কম আয়াসে এসব জায়গার বাজার দখল করা সম্ভব। এই সুযোগটাকে তিনি কাজে লাগাতে চাইছেন বাজার চাঙ্গা করার জন্য। কিছুটা সাফল্য এলেই একশো দিনের কাজের ওপর কোপ পড়বে, খাদ্য সুরক্ষা শিকেয় তোলা হবে। ব্যাংক-বিমা-ইপিএফ সব সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত হবে। চীনা মডেল নিয়ে মোদির নাকি উৎসাহ আছে। কিন্তু এই কাঠামোতে সে সব করা তাঁর পক্ষেও যে সম্ভব হবে না, সেটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কিন্তু সে যাই হোক— বাজারমুখী অর্থনীতি এবং তার সঙ্গে 'নমামি গঙ্গা' বাহিত হিন্দু জাতীয়তাবাদ— এর ওপরই দাঁড়িয়ে থাকবে এই 'বিকাশ পুরুষ'-এর রথ।

গ্রন্থ সমালোচনা

গদ্যসংগ্রহ : অমলেন্দু চক্রবর্তী

সমালোচনার বদলে

শুচিব্রত সেন

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'গদ্য সংগ্রহ' (দে'জ পাবলিশিং)। সংকলনে অমলেন্দুর-ই সুযোগ্য পুত্র প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী। ভূমিকা লিখেছেন উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষজ্ঞ অলোক রায়। যে অসাধারণ নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সাথে প্রিয়দর্শী অধুনালুপ্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে প্রবন্ধগুলি সংকলিত করেছেন, তার জন্য প্রাথমিক ধন্যবাদ তারই প্রাপ্য। শুধু ধন্যবাদে তার এই কাজের স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। বস্তুতপক্ষে এ ব্যতীত বৃহত্তর বাঙ্গালি সমাজ বঞ্চিত থেকে যেত অমলেন্দু চক্রবর্তীর লিখন শৈলীর এক নূতন মাত্রা থেকে।

উপন্যাসিক ও গল্পকার অমলেন্দু পাঠক সমাজে দীর্ঘদিন ধরেই সুপরিচিত। 'গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন', 'যাবজ্জীবন', 'রাধিকাসুন্দরী', 'আকালের সন্ধানে' প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে পাঠক অনুভব করেন একাত্মতা। বেশ কয়েকটি পুরস্কারে ভূষিত তাঁর কিছু গ্রন্থ। কিন্তু পুরস্কারটা বড় কথা নয়। সমাজ সচেতনতার সঙ্গে সাহিত্যিক শৈলীর নিবিড় যোগে সেগুলি উদ্ভাসিত স্বমহিমায়। কিন্তু তাঁর গদ্য সংগ্রহ পাঠ করতে করতে পাঠক হিসাবে আমাদের কাছে উন্মোচিত হয় অনুভব ও চিন্তার গভীরতার এক নূতন জগৎ।

বিষয়-বৈচিত্র্যে, যুক্তির পারম্পর্যে, উপলব্ধির গভীরতায়, চিন্তনের মৌলিকত্বে এবং শৈল্পিক উৎকর্ষে এই সংকলনকে নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। উপরন্তু, বহু পূর্বে লিখিত হলেও এর প্রাসঙ্গিকতাও অনস্বীকার্য। যে কোন বিবেকবান প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীই চান আত্মপ্রকাশের এক মাধ্যম। অমলেন্দু বেছে নিয়েছিলেন লেখাকে। তাঁর নিজের কথায়, ''ভারমুক্ত হতে চাই আত্ম-উন্মোচনে।'' (পৃ-৩২) শুধু ভারমুক্ত হওয়াটাই অবশ্য তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল না। ''কিন্তু স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্বপালনে যে কোন রকম ফাঁকিই তো শেষ পর্যন্ত এক ধরনের আত্মদ্রোহিতা।'' এই সাহিত্যিক ইতিহাসের এক সত্য তত্ত্বকে টেনে এনে তাই বলতে পারেন, ''যাঁদেরকে নিয়ে ইতিহাস রচনা, তাঁদের সঙ্গে কিছুমাত্র আত্মিক সংযোগ তৈরি না করে কি কোন ইতিহাসবিদ লিখতে পারেন মানুষের ইতিহাস?''(৩৯) পাঠক স্মরণ করতে পারেন ঐতিহাসিক ই এইচ কারের এই উক্তিটি, ''History cannot be written unless the historian can achieve some kind of contact with the mind of those about whom he is writing." (*What is History?*) এর পরেই অমলেন্দু বলেন, ''অথচ একজন কবি বা উপন্যাসিককে প্রতিদিনের জীবনচর্চায় খুঁজতে হয় মানুষের মুখ। সহস্রের জনতায় নিত্যসন্তরণে ইতিহাসের উজানেই ভাসতে হয় তাকে।'' অমলেন্দুর বক্তব্যে তাই কোথাও যেন এসে মিলে যায় ইতিহাসের জনতা ও সাহিত্যের সম্পাদ্য।

সংকলক সচেতনভাবেই গ্রন্থটিকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। বিষয়ভিত্তির সঙ্গে কালানুক্রমের একটি সঙ্গতিও তিনি মেনে চলেছেন। সবকটির আলোচনা স্থানাভাবে সম্ভব নয়। তাই কয়েকটি নক্ষত্র-উজ্জ্বল উদাহরণে চেষ্টা করব দেখাতে অমলেন্দুর বোধের গভীরতা ও তার তাৎপর্য। কল্লোল যুগের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি বলেছেন, তাঁদের সাহিত্যে চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা ও ধর্মগ্রন্থ রচনার অবনমনের বিষয়টি। (পৃ-৫২) প্রশ্ন উঠতে পারে, চলচ্চিত্র ইত্যাদি কি সমাজে অপাংক্তেয় কোন বস্তু? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু কল্লোলের লেখকবৃন্দ যেখান থেকে শুরু করেছিলেন তার একটা পরিণতির দিগ্-নির্দেশ দেবেন, তা যে হয় নি তা আমরা সবাই জানি। আর তাই উত্তরকাল কিছুটা দিগ্‌ভ্রান্ত। তাঁর এই নির্মোহ সমালোচনা প্রাসঙ্গিকতার এক উদাহরণ। গল্পগুচ্ছ আলোচনা করতে গিয়ে লেখকের পর্যবেক্ষণ, ''গল্পগুচ্ছের সঞ্চরমান নরনারীর পদধ্বনি রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে অশ্রুত।'' (পৃ-৫৫) কিংবা ''প্রতি যুগের আধুনিকতা তার স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত।'' (পৃ-৫৩) এর পরেও রবীন্দ্রনাথের গল্প সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, ''আধুনিক ছোট গল্প (ত্রিশের যুগ থেকে) নানাভাবে নানাপথে বাঁকে ঘোরার পরও 'গল্পগুচ্ছ' তার পাঠক হারায়নি। এই পাঠক আমাদের লেখকরা ক'জন পেয়েছেন?'' ভারী ভারী রবীন্দ্র গবেষণার পাশে এই ছোট প্রবন্ধটি গল্পগুচ্ছের এক জায়মান নির্দেশক।

'বাংলা ছোটগল্প : সাম্প্রতিক ঝোঁক'— অমলেন্দুর আরেকটি লেখায় আমরা খুঁজে পাই এক নির্মম ভাষণ। নগর-বিলাসী মধ্যবিত্ত লেখকরা হয়ে উঠছিলেন ''নিজেদের বিবরে নিজেরাই শৃঙ্খলিত।'' (পৃ-৬৯) বিচ্ছিন্নতা প্রবল হচ্ছিল, অথচ আক্রোশ ছিল, তাই জীবনবিরোধী সাহিত্যকর্মে ঘটে গেল আত্ম-সমর্পণ। এই প্রবন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান একটি উক্তি করেছেন অমলেন্দু— ''সৃজনশীল যুগই জন্ম দিতে পারে সৃজনশীল শিল্পীর'' (পৃ-৬৬)। কিন্তু মহৎ সৃষ্টি তা-ই যা যুগতিক্রমনীয়, আর এখানেই হেরে গেলেন, ব্যতিক্রম বাদে, '৬০-৭০ এর অধিকাংশ ছোটগল্পকাররা। বিদ্যুৎ চমকের মত একটি বক্তব্যে কী আশ্চর্যভাবে ধরা পড়ে আজকের, অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর এই দশকের শিল্পী সাহিত্যিকদের নগ্ন চরিত্রের অতিলোভাতুর জিহ্বা। ''আজ বিস্ময় জাগে, প্রতিষ্ঠান কি সত্যি অবতার? হরধনুও অবলীলায় ভাঙে'' (পৃ-৭১)। কল্লোল থেকে শুরু করে

'৬০-৭০ দশক পার হয়ে সাহিত্যিকের এই অনিবার্যতাই কি ইতিহাসের নিষ্ঠুর অনিবার্যতা?

'বাঙালিয়ানার মাপ' প্রবন্ধে পাঠক লক্ষ্য করবেন ভাষার এক ওজনদার পরিক্রমা। বক্তব্য যেন স্বাচ্ছন্দ্য ও তীব্রতার মেলবন্ধনে শুধু স্বাদু গদ্যের পরিচয় নয়, মাঝে মাঝে কাব্যিক এক ঝলকে মনকে প্রসন্নতায় ভরে দেয়।

''স্কাইস্ক্র্যাপারের ধারণা/ অতি সাম্প্রতিক নাগরিক বিত্তগরিমা।/ কিন্তু হাজার বছরের অনুক্রমণিকায়/এই মেটে ঘরটুকুই বাংলার চিরন্তনী।'' (পৃ-৮৩) *(পংক্তি গঠন বর্তমান নিবন্ধকারের)*

কিংবা, ''নীলার দু-ফোঁটা চোখের জলের লোনা স্বাদই/এক বুক সমুদ্রের ব্যাপ্তি পেয়ে যায়।''

'গদ্যে সংগ্রহ'র পঞ্চম পর্বটি নিবেদিত হয়েছে নাটক ও নাট্য সাহিত্য প্রসঙ্গে। উৎপল দত্ত নির্দেশিত 'ফেরারী ফৌজ' থেকে সুদূর বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ প্রযোজিত বিভিন্ন নাটক। স্বাভাবিক ভাবেই বাদ পড়ে নি নান্দীকার বহুরূপীর মত বিখ্যাত নাট্যসংস্থা। কিন্তু একই সাথে উপেক্ষিত হয়নি কার্জন পার্ক থিয়েটারের সিল্যুএট, শতাব্দী এবং অবশ্যই বাদল সরকারের নাট্য পরিকল্পনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টি। ১৯৯-২৩৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠক পেয়ে যাবেন '৬০-৭০ এর দশকের নাট্য আন্দোলনের এক সংক্ষিপ্ত ও সামগ্রিক নাট্য আলোচনা। সাধারণ পাঠকের বাইরেও, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্য সাহিত্য যাদের পাঠ্য বিষয়, তারাও উদ্বোধিত হবেন এক নূতন উচ্চারণে যা কিনা নোটসর্বস্ব বাজারি সমালোচনার বৃত্তের বাইরে। সামগ্রিকভাবে যুগটাকে ধরে নিয়ে তারই পশ্চাৎপটে আলোচিত এই নাটকগুলি। উঠে এসেছে প্রসেনিয়াম মঞ্চ। মুক্তমঞ্চ এবং মঞ্চবিহীনতার কথায়ও উঠে এসেছে কয়েকটি মণিমুক্তা। যথা, ''কিন্তু কোথাও যেন 'রক্তকরবী'র সময়কার প্রয়োজনগুলির সেই ঐশ্বর্যময় বিরাটত্ব আর দানা বেঁধে উঠছে না। গভীরভাবে কথা বলার যে অঙ্গীকার ছিল সৎনাট্যের বা নবনাট্যের, আস্তে আস্তে সে প্রয়াসগুলি এসে নিবিড় হয়ে উঠছে আত্মগত বিষয়ে।'' (পৃ-২১৭) সত্যিই তো। যে প্রতিশ্রুতির দায়বদ্ধতা নিয়ে শুরু হয়েছিল এই নাট্য-আন্দোলন, সেখান থেকে সরে এসে তা হয়ে উঠল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শুধু তাই নয়, নাট্য সংস্থাগুলির ভিতরকার বেশ কিছু কুৎসিত কলহ আমাদের ব্যথিত করেছিল। উপরন্তু অমলেন্দুর উষ্মা প্রকাশ করেছেন বিদেশি নাটকের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতায়। দেশজ মাটি অনেকটা বঞ্চিত হয়ে থাকল। আবার বিপ্রতীপের প্রশংসাতেও তিনি অকুণ্ঠ। '''রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' শুধু কাব্য নয়, জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গে সংপৃক্ত বিশ্ব-সংকটের নতুন নাট্যগঠন।'' (পৃ-২১৮) অথবা ''কেননা, বহুরূপীর বাঁচা তো আমাদের অনেকেরই বাঁচা'' (পৃ-২২৫)। একটা সময় পর্যন্ত তো একথাগুলি সত্যই ছিল। আজকের পদলেহী আত্মসম্মান বিসর্জনকারী দলদাস নাট্যব্যক্তিত্বদের কার্যাবলির জন্য সেদিনের সত্যটা মিথ্যা হয়ে যায় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নামকরণ 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে'। নামকরণেই ইঙ্গিত মেলে এ আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা সাবজেক্টিভ অথবা আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। কিন্তু এর তাৎপর্য তো নিহিত অন্যত্র। আজকে অনেকটাই অবহেলিত, কিন্তু এক সময়কার উজ্জ্বল নক্ষত্রদের পুনরবলোকন ইতিহাসেরই দাবি। মানুষ তো বৈচিত্রে ভরা, তাই শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গদ্যকার দেখেছেন ভিন্ন প্রেক্ষিতে। কোথাও তা ব্যক্তিমানস, কোথাও বা তা মতাদর্শের দৃঢ়তা। অথবা সঞ্জয় ভট্টাচার্য, এবং রাধামোহন ভট্টাচার্য, এই দুই ভট্টাচার্যের বিপ্রতীপ।

সংকলক-এর পরের অধ্যায়টির শিরোনাম দিয়েছেন 'বিবিধ প্রসঙ্গে'। এর মধ্যে 'শিক্ষা-সংকট : শিক্ষকের ভাবনা' লিখিত ১৯৭১-এ। আজ ২০১৪-য় এটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। লিখেছিলেন, ''যে স্কুলের যত বেশি মাইনে তত ভালো স্কুল।'' সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'রামধনু' চলচ্চিত্র তো এই বক্তব্যেরই ছবি। কিংবা ''দেশের সামগ্রিক ল-অ্যান্ড-অর্ডার সমস্যার মতোই অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাই আজ অধিকাংশ বিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যা।'' (পৃ-২৯৫) আজকের (২০১৪) পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক কী বলেন? তবে অমলেন্দুর সময় থেকে একটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়েছে। শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি হয়েছে আশাতীতভাবে। এর ফল হয়েছে অবশ্য বিপরীত। শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষক আন্দোলনের ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছে। সত্য একটাই, আর তা হল 'সংকট গভীরে' (পৃ-৩০০)। 'নির্মাণে সংকল্প চাই' প্রবন্ধটিতে সংকলকের অজান্তেই বোধ হয় পূর্ববর্তী প্রবন্ধ 'নতুন বোধোদয়' এর পুনরুক্তি ঘটেছে। (পৃ-৩০৭) এক অন্য মাত্রার, সঙ্গে নাট্যরূপ সহ প্রবন্ধ 'আষাঢ়ের সাতকাহন'' সাধারণ কথা থেকে গভীরতর চিন্তার দ্যোতনায় বোধের জগৎ নূতন করে উন্মোচিত হয়। মিডিয়ার দাপটের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গদ্যকার লিখছেন, ''এতে আত্মমগ্ন হয়ে থাকার ফলে আজকের ছেলেমেয়েরা সেনস অফ সাইলেন্স ভুলে যাচ্ছে।'' রচনাকাল ১৯৯৪। এরিখ হবসবম তাঁর শেষ বই Fractutred Times (২০১৩) এ জানাচ্ছেন, ''The consumer society seems to consider silence a crime.'' (পৃ-১৪)। কী বলবেন? Great men think alike?

শেষ পর্যায় অর্থাৎ 'ঋষ্যশৃঙ্গ'-কলমের লেখাগুলিও বৈচিত্র্যে ও গভীরতায় ভরপুর। আসলে অমলেন্দু চক্রবর্তী যে বিশ্বাসের গভীরতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রেরণা থেকে লেখাগুলি রচনা করেছেন, তার চিরপ্রবহমানতা অনস্বীকার্য। লেখক তাঁর লেখা ও জীবনচর্চাকে একসাথে মিলিয়েছেন। এ দুঃসময়ে সে বড় কঠিন কাজ। গনগনে সমাজ সচেতনতার সঙ্গে ভাষার ঋজুতা ও শৈল্পিক সততায় এই গদ্যসংগ্রহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মোড় ফেরানোর এক দিগ্‌চিহ্ন হিসাবে হয়ে থাকবে চিরভাস্বর।